রমাদান:

তৃষাতুর অপেক্ষা

হাফিজ আল মুনাদী
ফারহীন জান্নাত মুনাদী

গ্রন্থ :	রমাদান: তৃষাতুর অপেক্ষা
গ্রন্থস্বত্ব :	সংরক্ষিত ২০২০
প্রথম প্রকাশ :	০১ রমাদান ১৪৪১ হিজরি
প্রচ্ছদ :	খালেদ হাসান আরাফাত খান
অনলাইন পরিবেশক :	ওয়াহদা শপ- wahdashop. com +8801683 017633
মূল্য :	অন্তত দশজনের কাছে পৌছে দেওয়া
প্রকাশক :	নাহিদ হাসান রনি

সূচিপত্র

আলহামদু লিল্লাহ	০৫
এবারের রমাদান : আসুন, আশাবাদী হই	০৭
রমাদান : ভালোবাসার মাসে অমীয় সুধা	০৯
রমাদান: তৃষাতুর অপেক্ষা	১৩
অনুতাপের অশ্রুতে শুদ্ধ হও, হে কালিমামাখা অন্তর!	১৭
রমাদান: চলুক কুরআনের প্রতিযোগিতা	২০
রমাদান: তাকওয়ায় সাজুক জীবন	২২
রমাদান: মুত্তাকীর গুণগুলো হোক অর্জন	২৩
রমাদান: তাকওয়ার পোশাকে ক্ষমার সুসংবাদ	২৭
রমাদান: তারাবীহ হোক টানাহেঁচড়ামুক্ত	২৮
রমাদান: ভালোবাসার নযরানা	৩২
রমাদান: হাজার রাতের চেয়ে উত্তম যার ‘একটি’ রাত	৩৪
সওম: পৃথিবীর শুরু থেকে চলে আসা ইবাদাত	৩৮
সওম: তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম	৪০
সওম: রিয়ার সংশয়বিহীন এক ইবাদাত	৪৫
সওম: সংকল্প হোক গুনাহবিহীন দিন যাপনের	৪৭
সওম: সবরের মাদরাসা	৪৯
সওম: ভীতিকর দিনে স্বস্তির পরশ	৫১
সওম: ঢাল স্বরূপ যে রবে সামনে	৫৩
সওম: চাওয়া আর পাওয়ার মহিমা	৫৪
রমাদান: সওয়াবের খাযানা	৫৭
সওম: দুই আনন্দের এক বারিধারা	৬১

সওম: রাইয়্যানের শাহী তোরণ যাঁর অপেক্ষায়	৬২
রমাদান: শয়তানের বন্দিত্বে ডানা মেলুক মুক্তপাখি	৬৪
রমাদান: পরিবর্তনের সাওগাত	৬৮
সওম: ইখলাসের সুঘ্রাণে ভেসে যাক তনু-মনের দুর্গন্ধ	৭১
রমাদান: দূর হোক অপসংস্কৃতি	৭৩
জীবনের শেষ সালাত	৭৮
রমাদান :কেমন হবে পরবর্তী জীবন	৮৩

আলহামদু লিল্লাহ

আপনাকে ১৪৪১ হিজরির রমাদানে স্বাগতম, যখন কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মহামারীর আকার ধারণ করেছে, গোটা বিশ্ব তাতে স্থবির হয়ে পরেছে, সংক্রমণের ভয়ে ভাই ভাই থেকে পলায়ন করছে, কেউ মানবিক সেবায় অন্যের পাশে এগিয়ে যাচ্ছে, আর কেউ মৃত্যুর ভয়ে আপনজন ছেড়ে পালিয়ে বাঁচছে। কেউ বা এখনো অসচেতন, কেউ অনেকটা বেশীই সচেতন।

এমন পরিস্থিতে একজন মুমিন করনীয় ও বর্জনীয় হওয়া চাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে। কর্তব্য পালনের সামনে সে বলবে, ‘লা আদওয়া ফিল ইসলাম–ইসলামে কোনো ছোঁয়াচে রোগ নেই।‘ অর্থাৎ সংস্পর্শে এলেই যে রোগ হবে, এমনটি নয়।

আবার সতর্কতার প্রশ্নে সে বলবে– ‘নাহনু নাফিররু মিন কাদারিল্লাহি ইলা কাদারিল্লাহ–আমরা আল্লাহ্‌র তাকদীর থেকে আল্লাহ্‌র তাকদীরের দিকেই পলায়ন করছি।‘ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া যেমন রোগ সংক্রমণ করতে পারে না, তেমনি মহামারির মাঝে সংক্রমণের ক্ষমতা আল্লাহই দিয়েছেন, সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনও তাকদীরকে বিশ্বাস করার নামন্তর। কেননা আগুনে হাত পুড়ানোর বিষয়টিও তাকদীর দ্বারা লিপিবদ্ধ। তবে সেটিও আল্লাহ্‌র আদেশেই হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বললে–রোগীর ছোঁয়া লাগলেই রোগ হবে, এমন কোনো ছোঁয়াচে রোগ নেই; অবশ্য আল্লাহ কিছু কিছু রোগের মাঝে সংক্রমণ-ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন, যা আল্লাহ্‌র আদেশে সংক্রমিত হয়ে থাকে। সেই সংক্রমণকেও আল্লাহ তাকদীরে লিখে রেখেছেন।

এবার মূল কথায় আসি।
কোভিড-১৯ বা এর চেয়েও যত বড় বিপদই আসুক না কেন, মুমিন আল্লাহ্‌র নির্দেশনাকে উপেক্ষা করতে পারে না। নিছক বাহ্যিক উপকরণ নয়, মুমিনের কর্তব্য সর্বাবস্থায় তাকওয়ার পাথেয় সাথে রাখা। এমন নাজুক একটি সময়ে তাকওয়ার সরঞ্জাম অর্জনের জন্যই যেন দয়া করে আল্লাহকে আমাদেরকে রমাদান দান করছেন।

এবারের রমাদান অন্যবারের চেয়ে ভিন্ন, মসজিদ তালাবদ্ধ। জুমা ও তারাবির স্বাভাবিক সালাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জাতি। আলেমগণের প্রেরণামূলক কথা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। রমাদানের করণীয়, বর্জনীয় সংক্রান্ত বিষয়ে রচিত গ্রন্থও যে সংগ্রহ করবে পাঠক, সে পরিস্থিতিও নেই। তাই সময়ের দাবি ছিল এবারের রমাদানে ক্ষুদ্র হলেও কিছু করা, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও হয়তো কোনো এক ভাই কিংবা বোন সে কাজটি থেকে উপকৃত হবেন। ফলে ক্ষুদ্র আর ক্ষুদ্র থাকবে না, ভয়াবহ কিয়ামতের দিন তাই হবে আমাদের নাজাতের উসীলা।

প্রিয় পাঠক, ক্ষমা করবেন, বিভিন্ন ব্যস্ততায় যতটা গোছালোভাবে বইটি উপস্থান করা প্রয়োজন ছিল, তা হয়ে ওঠেনি। তবুও প্রয়োজন মনে করে যতটুকুই হয়েছে, তাই প্রকাশ করা হল। আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে ইন শা আল্লাহ আগামী রমাদানের পূর্বে আমরা এটিকে আরও সংযোজন-বিয়োজন করে মলাটবদ্ধ করে পেশ করার চেষ্টা করব। কোনো ভুল ত্রুটি চোখে পড়লে আমানাত হিসাবে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ। জাযাকুমুল্লাহ।

হাফিজ আল মুনাদি
ফারহীন জান্নাত মুনাদি
২৯ শাবানা ১৪৪১ হিজরি

এবারের রমাদান : আসুন, আশাবাদী হই

আমি অস্বীকার করছি না যে, কোভিড-১৯ কোনো বিপদ নয়। তবে মুমিনের বিষয় বড়োই অদ্ভূত! সামান্য দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়তের বদৌলতে সে তার বিপদকে নিয়ামতে পরিণত করে নিতে পারে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, সামান্য কাঁটা পায়ে বিদ্ধ হলে মুমিন যদি সবর করে, তবে আল্লাহ মুমিনের গুনাহকে মিটিয়ে দেন। আল্লাহ তো বান্দাকে বিপদ দিয়েই থাকেন তার গুনাহ মাফ করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র রাহে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। আল্লাহ বলেন,

لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'যেন তিনি তাদেরকে তাদের কর্মের কিছুটা ভোগ করান, উদ্দেশ্য- তারা যেন ফিরে আসে।'[1]

বান্দা যখন বিপদে পড়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তবে এ বিপদ তার জন্য নিয়ামত। বান্দা যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেয়েও কৃতজ্ঞতা আদায় না করে তবে নিয়ামতও তার জন্য আযাব।

বিপদে পড়েও কেউ যদি আল্লাহ্‌র দিকে না ফিরে, বরং বাহ্যিক উপকরণ দ্বারাই নিছক মুক্তি খুঁজে, তবে নিশ্চয় এ বড় দুর্ভাগ্যের কথা। পক্ষান্তরে কোনো মুশরিকও যদি বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকে তবে হতে পারে, তার হিদায়াতের সম্ভাবনা সূর্যের কীরণ হয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কেননা একজনের আচরণে আছে ঔদ্ধত্য, আরেকজনের আচরণে রয়েছে বিনয়। আল্লাহ মুমিনকে বিপদ দেন বিনীত হওয়ার জন্য। আল্লাহ বলেন,

فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

'তবে তাদেরকে অভাব অনটন স্পর্শ করেছে যেন তারা বিনীত হয়।'[2]

১ সূরা রূম : ৪১

নূহ আলাইহিস সালাম-এর সন্তান যখন জলোচ্ছ্বাসে ডুবে মরছিল, আল্লাহ্‌র নবীর তখন আশা জাগলো, ছেলে হয়তো এখন ফিরে আসবে। তিনি বললেন, বাবা, আমার সাথে জাহাজে ওঠো। সন্তান বলল,

---

سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعۡصِمُنِى مِنَ ٱلۡمَآءِۚ

আমি পাহাড়ে আশ্রয় নিব, তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।'[3]

পক্ষান্তরে মুমিন ব্যক্তির গুণ হলো বিপদ আসা মাত্রই সে বলে, এটা আল্লাহ লিখে রেখেছেন বলেই হয়েছে। ফলে মুমিন আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসে, তাঁরই উপর ভরসা করে। আল্লাহ বলেন,

---

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

'বলো: আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখে রেখেছেন তা ছাড়া কিছুই আমাদেরকে কিছুতেই স্পর্শ করে না; তিনিই আমাদের মাওলা। মুমিনরা যেন আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করে।'[4]

এবারের রমাদানে আর্থিকভাবে হয়তো অনেককেই কষ্ট পোহাতে হবে। অফিস বন্ধ। ব্যবসা বন্ধ। অভাব, অনটন কিংবা গৃহবন্দিত্বকে খোলামনে দেখুন। এগুলোকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করুন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা পৃথিবীর জন্য প্রেরিত রাসূল হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন কি খাবার পেতেন? আয়েশা রা. জানিয়েছেন, দু'মাস চলে যেতো, আমদের ঘরে চুলা জ্বলতো না। তবে কী খেয়ে দিনাতিপাত করতেন তারা? হ্যাঁ, দুটি বস্তু–খেজুর আর পানি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন খেতেন, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন। আরেকদিন অনাহারে থাকতেন, ধৈর্য ধারণ করতেন। ধৈর্যও যে একটি

---

[২] সূরা আনয়াম : ৪২

[৩] সূরা হুদ : ৪৩

[৪] সূরা তাওবা : ৫১

নিয়ামাত, যা মানুষ বিপদের মধ্য দিয়ে লাভ করে। আল্লাহকে যদি পেতে চান তবে শুনুন-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'[5]

আল্লাহ আরও বলেন,

لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

এটাকে তোমাদের জন্য অকল্যাণ মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[6]

এবারের রমাদানে আশাবাদি হোন। দেখুন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাত-দিন আল্লাহ্‌র ইবাদতে ও তাঁর সান্নিধ্যে নিমগ্ন থাকতেন। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে আল্লাহ আপনাকে সারা রামাদান দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন রমাদানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মহত্ত্ব অনুধাবন।

রমাদান : ভালোবাসার মাসে অমীয় সুধা

তখনও নবুওয়তের আলো প্রস্ফুটিত হয়নি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলই আল আমীন, নবীর মর্যাদায় ভূষিত হননি; হেরা গুহায় কাটিয়ে চলছেন দিনরাত। এক অমোঘ আকর্ষণে পেরিয়ে যায় তাঁর নীরব একাকী মুহূর্তগুলো। নাহ, ভুল হলো। যাঁর ধ্যানে, যাঁর অন্বেষণে তিনি ছিলেন তৃষ্ণার্ত; তাঁর

---

[৫] সূরা বাকারা : ১৫৩

[৬] সূরা নূর : ১১ । এটি একটি ফিতনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে, তবে আয়াতটি থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি।

প্রেমিকরা কখনো একা হতে পারে না। তিনি সব সময় তার আশ্রয় হয়ে থাকেন। হ্যাঁ! ঘোর আঁধারে নিমজ্জিত জাহেলী সমাজেও যে ক'জন গুটিকতক মানুষ তাওহীদের আলোয় আলোকিত ছিলেন, তাঁদের শিরোমণি ছিলেন আমাদের নবী।

ভালোবাসায় সিক্ত হৃদয় সকল সময় আকুল হয়ে থাকে কখন আসবে ডাক প্রেমময়ের তরফ থেকে! ধ্যানে মগ্ন হৃদয়ের ধ্যান হঠাৎই চমকিত আনন্দে ভঙ্গ হবে পরম প্রিয়ের আহ্বানে।

কিন্তু এত আচমকা? এত গভীর উচ্ছ্বাস নিয়ে? এত সম্মান, শ্রদ্ধা আর বিস্ময় নিয়ে?
প্রভুর প্রথম ডাক হৃদয়ে ছড়িয়েছিলো এক অবিশ্বাস্য দ্যুতি, দেহে তুলেছিলো কাঁপুনি। কাঁপতে কাঁপতে তাই সঙ্গিনী খাদীজাকে বলেছিলেন, 'যাম্মিলু নী, যাম্মিলু নী....', 'গায়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, গায়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'....
কী ছিলো সেই ডাক? আকাঙ্খিত কথা? যার প্রথম ঝাঁকুনি ছিলো এত তীব্র?

তা হলো—'ইক্বরা!', 'পড়ো!'
'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'
এ তো ডাক নয়, শ্বাশ্বত অমীয় সুধা। যে সুধায় আজও তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে তৃষিত হৃদয়। মিটিয়ে যাবে কিয়ামত অব্দি।
কবে এসেছিলো পবিত্র সে সত্ত্বার পক্ষ থেকে সে আলোকবর্তিকা? পথচলার নির্দেশিকা?

রমাদানে। দ্বারে কড়াঘাত করছে যে বরকতময় মাস। সর্বপ্রথম লাওহে মাহফূজ থেকে পুরো কুরআন মাজীদ নিকটতম আসমানে নাযিল হয়েছে এই মাসে। দুনিয়ার আসমান থেকে আমাদের নবীর উপর প্রথম ওহীও নাযিল হয় এ মাসেই। আল্লাহ বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

রমাদান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের জন্য পথনির্দেশক, সুপথ প্রাপ্তির সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ও হক্ব-বাতিলের মাঝে বিভাজনকারীরূপে।[7]

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, রমাদানে কুরআন নাযিল হয়েছে, তাই এ মাসে সওম পালন করো।
এ যেন কুরআনকে স্বাগত জানানো. কুরআনকে হুদানরূপে গ্রহণের অনুশীলন।

আল্লাহ উক্ত আয়াতে যদিও জানিয়ে দিয়েছেন সমগ্র মানবতার দিকনির্দেশনারূপে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তাই বলে কি সবাই হিদায়াতরূপে গ্রহণ করে? করে না। হিদায়াতরূপে গ্রহণ করতে যোগ্যতা লাগে। সেই যোগ্যতার নাম তাকওয়া। তাই তো আল্লাহ সূরা বাকারার শুরুতে বলেন,

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

'ওই কিতাব - কোনো সন্দেহ নেই তাতে - মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।

এই মাসে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন, অপরদিকে কুরআনকে হুদানরূপে গ্রহণের জন্য সিয়ামের মধ্য দিয়ে তাকওয়া অর্জনেরও ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং রমাদানে মাসব্যাপি চলতে থাকুক তাকওয়া ও কুরআনের চর্চা।
তাকওয়া ও কুরআন এমন গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় - কুরআনে যে দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ 'যথাযথ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

[৭] সূরা বাকারা : ১৮৫

'হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো'।[৪]

তেমনি আল্লাহ বলেন, 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি আর তারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে, তারাই এ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে। '

যথাযথ তিলাওয়াত মানে ধীরে ধীরে পূর্ণ মনোযোগের সাথে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে পড়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা। যথাযথ ঈমানের জন্য প্রয়োজন যথাযথ তিলাওয়াত। যথাযথ তিলাওয়াতের জন্য প্রয়োজন যথাযথ তাকওয়া। যথাযথ তাকওয়া নির্ভর করছে আপনি রমাদানকে যথাযথভাবে কাজে লাগাচ্ছেন কিনা, রমাদানের সিয়াম যথাযথভাবে আদায় করছেন কিনা।

ভালোবাসায় মোড়া এ মাস সব মাসের চেয়ে উত্তম। মোক্ষম সময় প্রভুর কাছাকাছি হওয়ার। ইবাদাতে ডুবে গিয়ে অপার্থিব আলো গায়ে মাখার। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ

মুসলিমদের জন্য রমাদানের চেয়ে উত্তম কোনো মাস আসেনি এবং মুনাফিকদেরজন্য রমাদান মাসের চেয়ে অধিক ক্ষতির মাসও আর আসেনি।[৯]

সেরা মাসে যবানে যবানে উচ্চারিত হোক অমীয় সে সুধা; জিহ্বা সর্বদাই সিক্ত থাকুক রবের দেয়া উপহারে–তাঁর যিকরে, তিলাওয়াতের সুমধুর সুরে।

৮ সূরা আলে ইমরান: ১০২

৯ মুসনাদু আহমাদ : ৮৩৬৮; মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা: ৮৯৬৮; সহীহু ইবনি খুযাইমা: ১৮৮৪; তবারানী: ৯০০৪; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান: ৩৩৩৫

রমাদান: তৃষাতুর অপেক্ষা

চৈতের খরায় শুকনো খটখটে মাটি তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে অপেক্ষায় থাকে একটা ফোঁটা বৃষ্টির জন্য, বোশেখী মুষলধারায় বৃষ্টিতে সে হয়ে উঠে সজীব; যেন এই তার পরম আকাঙ্ক্ষিত সময়, বুড়িয়ে যাওয়া বয়সটাকে যৌবনে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ। সারাবছর একজন কৃষক অপেক্ষায় টুক টুক করে খাটতে থাকে একটি বিশেষ সময়ের অপেক্ষায়। বৈশাখ তাদের জন্য সে সময়। এই এক মাসের হাড়ভাঙা খাটুনিতে উঠেয়াসে সারা বছরের জীবিকা। তাই, নবান্নতে সফলরা হয়ে উঠে উচ্ছ্বসিত।

একজন চাকুরে সব সময় অপেক্ষায় থাকে, কখন আসবে ঈদ কিংবা বিশেষ উপলক্ষ। বোনাস পেয়ে সে হয় উদ্বেলিত।

পাখ-পাখালি, গাছ-গাছালিও অপেক্ষায় থাকে একটা বিশেষ সময়ের। যে সময় সে সাজবে বাহারি রঙে। লাল-সবুজ-হলুদ রঙে রঙে ছড়াবে সুবাস বিশ্বময়। পাখিরা গাইবে, সকালে ঘুম ভাঙাবে সুমধুর কিচিরমিচির স্বরে। তাদের মনোহরি গানে পরিবেশ হবে মুখরিত। বসন্ত তাদের সে প্রাণের মাস, রঙের মাস।

তেমনি মুমিনেরও রয়েছে এক বসন্ত। এক বোশেখ। এক উপলক্ষ। যে সময়ের অপেক্ষায় সে কাটাবে বছরের বাকী দিন, মাস। যে সময়ে সে পূর্ণ করবে তার ঝুলি। সংগ্রহ করবে বেশী বেশী পুণ্য আর সারাবছরের পুঁজি। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অপেক্ষা করতেন যে সময়ের। চাইতেন, রব যেন তাঁকে সে সময়টি পাওয়ার তাওফীক দেন।

হ্যাঁ, মুমিনের সে বিশেষ সময় হলো–রমাদান।
রজব এলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বরকত দিন রজবে ও শা’বানে আর আমাদের পৌঁছে দিন রমাদানে!’
আহ! কী প্রতিক্ষা!
কী ব্যাকুলতা!

কতটা মহিমান্বিত হলে সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতটা আকুল হতে পারেন।
হবেন না-ই বা কেন! তিনি যে ছিলেন সর্বাধিক মুত্তাকী আর রমাদান সে মুত্তাকীদের ফসল ফলানোর মাস।
আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
'তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিলো পূর্ববর্তীদের উপর; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।'

রমাদানের শুরু থেকেই চলে তাকওয়া অর্জনের চর্চা। এর আগে জানতে হবে, তাকওয়া, আল্লাহভীতি কী? সিয়াম আর তাকওয়ার মাঝে সম্পর্ক কী? এই জানার মাধ্যমে শুরু হোক আমাদের রমাদান প্রস্তুতি। তাকওয়ার শিক্ষায় উদ্ভাসিত হোক আমাদের দিন, মাস, বছর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রস্তুতি ছিলো নিজেকে মুত্তাকীর গুণে গুণান্বিত করার শিক্ষা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। তাকওয়ার চর্চা ছিলো তাঁর পুরো জীবন জুড়ে। সারা বছরই তাঁর লক্ষ্য ছিলো সিয়াম ফরজ হওয়ার এ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। স্বয়ং তিনি বলেন: 'আমি তোমাদের মাঝে সর্বাধিক আল্লাহভীরু'।[10]

রজব এলেই শুরু হয়ে যেতো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসন্ন রমাদানের দেখা পাওয়ার প্রতীক্ষা । অধীর আগ্রহে তিনি অপেক্ষা করতেন সে মাসটির, যে মাসটিতে স্বার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলো তাঁর গারে হেরার নির্জনতা, একক সত্ত্বাকে চিনতে পারার সাধনা; যে মাসটিতে তিনি শুনেছিলেন হৃদয় শীতলকারী আহ্বান – পড়ো তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন!

---

[১০] সহীহুল বুখারী : ৭৩৬৭

রজব থেকেই তাই রাসূলের যবানে উচ্চারিত হতে থাকতো–

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
'হে আল্লাহ! আমাদের বরকত দিন রজব এবং শাবানে আর পৌঁছে দিন রমাদানে।'

বছরের অন্যসময়ে রাসূলের সিয়ামের অভ্যাস ছিলো সোম আর বৃহঃবার, আইয়্যামে বীজ ইত্যাদি। কিন্তু শাবান আসলেই রমাদানের প্রস্তুতি স্বরূপ তিনি সিয়াম পালন করতেন অত্যধিক হারে। শাবানের প্রায় প্রথমার্ধেক কেটে যেত সিয়াম পালনেই। হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবানের কিছু অংশ ছাড়া পুরো শাবান সওম পালন করতেন।[11]

তবে কোন হাদীসে শাবানের শেষার্ধেক, কোথাও রমাদানের দুয়েকদিন পূর্ব থেকে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। এও রমাদানের প্রস্তুতিই বটে। কারণ, পুরো শাবান সওম পালন করলে হবে? রমাদানের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে না? হাদীসে এসেছে, 'যখন শা'বানের অর্ধেক চলে যাবে, তখন তোমরা আর সিয়াম করবে না'।[12]
অন্যত্র এসেছে, 'রমাদানের দুই বা একদিন আগ থেকে তোমরা আর সিয়াম করবে না, তবে যদি কারো অভ্যাস থেকে থাকে, সে করতে পারে।'[13]

আমাদের নবি ও সালাফগণের প্রস্তুতি এমনই ছিল–
তারা সওমের অভ্যাস চালু করার জন্য শাবান মাস জুড়েই সিয়াম পালন করতেন, আবার যেন সম্পূর্ণ শক্তি ফুরিয়ে না যায়, তাই শাবানের শেষার্ধে কিছুদিনের বিরতি নিতেন। যেন পূর্ণ উদ্যমে আত্মনিয়োগ করা যায় রমাদানের ইবাদাতে–সিয়ামে, সালাতে, তিলাওয়াতে। ওদিকে রমাদানের দু মাস পূর্বে রজব থেকেই শুরু

---

[১১] সহীহুল বুখারী, ১৯৭০
[১২] সুনানু আবূ দাঊদ: ৩২৩৭
[১৩] সহীহুল বুখারী: ১৯১৪

হয়ে যেত দুআ–'হে আল্লাহ! আমাদের বরকত দিন রজব এবং শাবানে আর পৌঁছে দিন রমাদানে।'

আমাদের প্রস্তুতি কি হয় এমন? আমাদের রমাদান প্রস্তুতির গল্পগুলো যেন এমন–

১

– ভাই! রমাদানের প্রস্তুতি হলো?
- হ্যাঁ ভাই! বেতন-টেতন সব নিয়ে নিয়েছি। শপিংটাও সেরে ফেললে ভালো হতো। রমাদানে সিয়াম করে কষ্ট হয়ে যায়। দেখা যাক!

২

- ভাবী! রমাদানে প্রস্তুতি হয়ে গেছে?
- হ্যাঁ ভাবী। ডাল, বেসন, বুট সবই আনিয়ে ফেলেছি। এখন শুধু পেঁয়াজটা আনা বাকী। আজ রাতে ফেরার পথে বাবুর আব্বুকে বলে দিয়েছি নিয়ে আসতে।
সত্যি! এই আমাদের বাস্তবিক অবস্থা।
যদি গুণতে শুরু করেন ক’জন শাবানে সিয়াম করেছে, দোয়া পড়েছে, দেখবেন হাতের কড়ে আঙ্গুল অব্দি গুণতে পারবেন না। এর আগেই সংখ্যা শেষ হয়ে যাবে।
যারা এমন, তারা বঞ্চিত রমাদানের মাহাত্ম্য থেকে।
তারা উপলব্ধি করতে পারে না, রমাদানকে ঘিরে রবের দয়া।
তাদের তনু-মন প্রশান্ত করতে পারে না রবের তাযকিরাহ।
আমরা কি হতে চাই এমন? না।
কোন মুমিনেরই হতে চাওয়া উচিত নয় এমন।
তবে এখন থেকেই শুরু হোক পরিবর্তনের চেষ্টা।
রমাদানের যথাযথ প্রস্তুতিতে আমরা তৈরি করি অন্তঃকরণ।

অনুতাপের অশ্রুতে শুদ্ধ হও, হে কালিমামাখা অন্তর!

আল্লাহর এক নাম যেমন 'রহীম'–দয়াশীল, তেমনি আরেক নাম 'আযীয'–পরাক্রমশালী। আমাদের গুনাহের যে বিশাল স্তুপ, নাফরমানীর যে দীর্ঘ তালিকা; স্পষ্টই আল্লাহর অসীম দয়া ও ক্ষমা ছাড়া মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়৷ যেখানে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহর রহমতপ্রার্থী, সেখানে আমাদের মত পাপীরা কত নিশ্চিন্তে বসে আছি!

আসলে তাওবার সাথে একজন মুমিনের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? গুনাহের কারণে কতটুকু সংকুচিত হওয়া উচিত? মুমিন তো গুনাহ হওয়া মাত্রই অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় রবের কাছে। অপরাধী গোলামের ন্যায় নুয়ে পড়ে মহামহিমের দরবারে। তবুও অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হৃদয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কেবলই ভাবে– এ কঠিন গুনাহের ক্ষমা মিলবে কি!!

গুনাহের কারণে অন্তরে এক দাগ পড়ে যায়, যদি ফিরে আসা না হয় তবে সে দাগ থেকে জন্ম নেয় দগদগে ঘা। ধীরে ধীরে সে অন্তর মরে যায়। তখন ব্যক্তির অবস্থা এমন হয় - সে সবই দেখে, কিন্তু অন্তরে সত্যের ছাপ পড়ে না; সে সবই শোনে, কিন্তু সত্য তার অন্তরে পৌঁছায় না। ধীরে ধীরে সে পরিণত হয় জাহান্নামের জ্বালানিতে।

রমাদান মুমিনের জন্য বিরাট এক পাওয়া। অন্তরকে দাগমুক্ত করতে, মৃত অন্তরকে আবারও ইবাদাতের সেচ দিয়ে সজীব করে তুলতে।
রমাদান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া এক সুযোগ- আবদার আদায়ের, দোষ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রাপ্তির। কারণ, এ মাসে আল্লাহ অবারিত করে দেন ক্ষমার দরজা।
শিরক ছাড়া আর কোন গুনাহ করেছো তুমি? যত গুনাহই হোক, ক্ষমা তো একজনের কাছেই!
কত বড় গুনাহ করেছো তুমি? রবের ক্ষমার দরজা তারচে'ও বড়!
কতটা কঠিন গুনাহ করেছো তুমি? প্রভুর দরবার যে তারচে'ও উদার!

আল্লাহ চাইলে মাফ করতে পারেন যখন ইচ্ছে তখন, তবু কিছু কিছু সময়কে তিনি বিশেষায়িত করেছেন ক্ষমার জন্য, যেন বান্দা মাফ চাইতে উৎসাহী হয় এবং কালিমামাখা অন্তর অনুতাপের অশ্রুতে ধুয়ে মুছে শুভ্র হতে অনুপ্রেরিত হয়। সে সময়গুলোতে মাফ পাওয়ার আশাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। রমাদান তেমনই এক সময়। তাঁর পক্ষ থেকে এক উপহার, সুবর্ণ সুযোগ; শুদ্ধ হওয়ার, শুভ্রতায় আলোকিত হওয়ার, কালিমামুক্ত হৃদয় পাওয়ার।

এ সুযোগের জানান দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِن لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা (রমাদানে) প্রতি ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। প্রতি রাতেই তা হয়ে থাকে।[14]

এছাড়াও হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

الصلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُن إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِر.

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহকে মুছে দেয় যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।[15]

কিভাবে মুছে যাবে সব গুনাহ? কিভাবে আমি হবো শুদ্ধ?
অনুতাপের অশ্রুতে, আল্লাহর কাছে নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় হাত পেতে!
এ অশ্রু হোক না কেবল একটি ফোঁটাই!
নিজেকে বিশুদ্ধ করতে, গুনাহের সব দাগ ধুয়ে মুছে পবিত্র হতে এক ফোঁটা অশ্রুই যথেষ্ট-

---

[১৪] মুসনাদু আহমাদ : ২২২০২, সুনানু বাইহাকী : ৩৬০৫
[১৫] সহীহুল মুসলিম

যে অশ্রু কেবল নোনা স্বাদের এক ফোঁটা বারি নয়;
যে অশ্রু খাঁটি, বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ।
যে অশ্রুতে রয়েছে নিখাদ অনুতাপ, অনুশোচনা।
যে অশ্রুতে রয়েছে লজ্জা।
যে অশ্রুতে রয়েছে অসহায়ত্ব।
যে অশ্রুতে রয়েছে আত্মসমর্পণ।
যে অশ্রুতে রয়েছে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রত্যয়।
যে অশ্রুতে রয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতা না করার অদম্য সংকল্প।
যে অশ্রু আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনের।
যে অশ্রু ভুলগুলোকে শুধরে নেবার।
যে অশ্রু স্নেহময়ের আশীষ পাবার আনন্দের।
তবে এ অশ্রু কেন পবিত্র করবে না আমাদের? কেন দয়ার দাবী করবে না করুণাময়ের দরবারে?
এ অশ্রু যে রবের প্রিয়। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'দু'টি ফোঁটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়–
১. জিহাদের ময়দানে ঝরে পড়া রক্তের ফোঁটা,
২. আল্লাহর ভয়ে ঝরে পড়া অশ্রুকণা'।

আর রমাদান তো মুমিনেরই মাস। গুনাহের প্রতি নিখাদ অনুশোচনা, আল্লাহর কাছে পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, আনুগত্যের দৃঢ় অঙ্গিকারে সজ্জিত রমাদান যেন নূরুন আলা নূর। আল্লাহ্ কি ক্ষমা করবেন না? অবশ্যই করবেন ইন শা আল্লাহ্। দয়াময়ের কাছে যে এই-ই আমাদের আশা আর দয়াময় বান্দার কাছে তাঁর প্রত্যাশানুযায়ীই হয়ে থাকেন।
এরপরও যদি ক্ষমাপ্রাপ্তি না হয়? তবে নিঃসন্দেহে কোন খাদ রয়েছে অনুতাপে কিবা পূর্ণ আত্মসমর্পণে কিংবা আনুগত্যের অঙ্গীকারে। আর আল্লাহ্ খাদযুক্ত অশ্রু গ্রহণ করেন না। তাই তো, ক্ষমা লাভের এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও যে ব্যক্তি নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করাতে পারে না সে সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত। হাদীসে তার জন্য বদ দুআ করা হয়েছে। এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমাদান মাস পেল, তবুও তার গুনাহ মাফ হয় না।[16]
অথচ প্রতি দিনের মত রমাদানেও আল্লাহ্ শেষ রাতে ডাকতে থাকেন– ‘কে আছো ক্ষমা চাওয়ার? আমি ক্ষমা করবো’!
কত মায়াময় আহ্বান পবিত্র করতে! কত ভালবাসার হাতছানি মুক্তি দিতে! এখন পরীক্ষা আমাদের। আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর রঙ গায়ে মাখবো নাকি শয়তানের প্ররোচনায় লালায়িত হয়ে জাহান্নামের জ্বালানী হবো!

রমাদান: চলুক কুরআনের প্রতিযোগিতা

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর দায়িত্ব ছিলো নবীদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রেও ছিলো না এর ব্যত্যয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় অপেক্ষায় থাকতেন, জিবরাঈল আ. কখন আসবেন, কখন রবের নতুন বাণী শুনবেন।

রমাদান এলে রাসূলের এই প্রতিক্ষা যেন আরও বেড়ে যেতো, আরও বেশী ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষায় থাকতেন জিবরাঈল আ.এর। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং জিবরাঈল আ. - দু’জনে এক উত্তম কাজে পরষ্পরের সঙ্গী হতেন, দু’জন দু’জনকে কুরআন মাজীদ শোনাতেন। তাই রমাদানে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেত রাসূলের কুরআন তিলাওয়াত। আরও বেশী করে যবানে জারী থাকতো কালামুল্লাহ শরীফ। হাদীসে এসেছে –

وكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ القُرْآنَ.

[১৬] মুসতাদরাকু হাকেম : ৭৩৩৮

জিবরীল আ. রমাদানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন মাজীদ শোনাতেন।[17]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আমল অধিক হারে করতেন, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহু আলাইহিম আজমাঈনের মাঝেও সে আমলের প্রসার ঘটতো ব্যাপকহারে। রমাদানে তাঁরাও বাড়িয়ে দিতেন তিলাওয়াতে কুরআন।
যেন বেহেশতী পরিবেশ!
ঘরে ঘরে তিলাওয়াতের সুমধুর সুর।
জনে জনে তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা।
হবে না-ই বা কেন!

রমাদান এক উত্তম মাস। তিলাওয়াত এক উত্তম আমল। সুন্দর সমন্বয়। উত্তম প্রতিদানের উসীলা। তাই সালাফে সালেহীনের জীবনীতেও পাওয়া যায়, পরিবার-পরিজনসহ তাঁরা মনোনিবেশ করতেন খতমে কুরআনের প্রতিযোগিতায়।[18]
এঁরাই আমাদের উত্তরসূরী।
আমাদের অনুসৃত।
আমাদের ঘরে কি তবে হবে না তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা? বাজবে না তিলাওয়াতের সুমধুর সুর?

[১৭] সহীহ বুখারী : ১৯০২

[১৮] তারা খতমের প্রতিযোগিতা করতেন না, করতেন ইবাদতের ও কুরআন চর্চার প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ যতটুকু কুরআন পড়তেন, হক্ব আদায় করেই পড়তেন। শেষ করতে হবে বলে তাড়াহুড়া করতেন না, বরঙ ধীরস্থীরতার সাথে বেশী সময় তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতেন।

রমাদান: তাকওয়ায় সাজুক জীবন

তাকওয়া। খোদাভীতি। মুমিন জীবনের এক নিদর্শন হলো, আল্লাহকে ভয় পাওয়া- জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সকল সময়ে, সমস্ত অবস্থায়।
একাকী নির্জনতায় কত গুনাহের হাতছানি। একা রাত্তিরে বসে একটা মুভি। কে দেখছে? কেউ না!
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বার্তাঘরে এক বেগানা নারী/পুরুষ। কে দেখছে? কেউ না!
সালাতের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে, আপনি দুনিয়ার নেশায় মত্ত। কে দেখছে? কেউ না!
আহ! আমরা ভুলে যাই!
একজনের দেখা কখনো বন্ধ হয় না!
তার ঘুম নেই! নেই নিদ্রা!
তিনি উদাসীন নন, তাঁর নেই অসচেতনতা!আর...... আর......
কেবল তাঁর কাছেই আমাদের সকল জবাবদিহিতা। অথচ তাঁকেই আমরা গ্রাহ্য করি না।

আবার যে মানুষের ভয়ে আমরা নির্জনে গুনাহ করি, সে মানুষের কাছে কিন্তু আমাদের কোন জবাবদিহিতা নেই!
মানুষ কী বিচিত্র!
আমরা কী অদ্ভুত!
তাঁকে দেখি না বলেই কি তাঁর ভয় আমাদের অন্তরে অনুপস্থিত? তাঁর ব্যাপারে আমরা থাকি অসচেতন? ভুলে থাকি ভয়াবহ সে হিসাব দিবস?
ক্ষতি তো আমাদেরই! ধ্বংস তো আমাদেরই!

অর্জন করতে হবে তাকওয়া, আল্লাহভীতি। লোকসম্মুখে, একাকি নিরলে, সর্বাবস্থায় তাঁর দর্শনের অনুভূতি হতে হবে প্রচণ্ড রকমের অনুভূত। লোকলজ্জা বা সামাজিক লাঞ্ছনা- সবকিছু থেকে তাঁর ভয়ই হতে হবে প্রকট।

এ তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় অর্জনের এক মহা সুযোগ মাহে রমাদান। কী করে?

সকাল থেকে আপনি অভুক্ত। ক্ষুধা লেগেছে খুব। খাবারও উপস্থিত। তবু আপনি খাচ্ছেন না। কেন? আল্লাহর ভয়ে।
প্রচণ্ড পিপাসায় অস্থির, পানিও হাতের নাগালে। তবু পানি পান করে পিপাসা নিবারণে আপনার আগ্রহ নেই। কেন? আল্লাহর ভয়ে।
স্বামী বা স্ত্রী একসাথেই আছেন। পারস্পরিক ভালোবাসাও কম নয়। তবুও দু'জনেই নিজেকে সামলে রাখছেন। কেন? আল্লাহর ভয়ে।

এভাবেই, পুরো রমাদান জুড়ে সম্ভব তাকওয়ার অনুশীলন। শুধু সওম ভঙ্গকারী কাজই নয়, তাকওয়ার অনুশীলন চলুক সব কাজেই। এক মাসের পুরো অনুশীলন কি আমাদের সারাবছর তাকওয়ার পথে চলার অনুপ্রেরণা হবে না? ইন শা আল্লাহ্, অবশ্যই হবে। আল্লাহ্ বলেন,

---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।'

রমাদান: মুত্তাকীর গুণগুলো হোক অর্জন

অভিধান খুললেই তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ পাওয়া যাবে। তাকওয়ার তাৎপর্য অনুধাবনে খুলতে হবে কুরআন। আর এর বাস্তব নমুনা খুঁজতে হবে আমাদের নবি, সাহাবি ও সালাফের জীবনিতে।

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা। ইসলামে তাকওয়ার বলতে বুঝায় আল্লাহ্‌র ভয়। আমাদের নবি জানিয়েছেন, এ ভয়ের অবস্থান অন্তরে। অন্তরে তাকওয়া স্থিত হলে তা প্রকাশ পায় কর্মের

মধ্য দিয়ে। তাকওয়ায় হলো ভালোবেসে আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করা এবং তাঁর ভয়ে তার নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা।

তাকওয়া মুমিনের গুণগত অবস্থা, কিছু কাজের মধ্য দিয়ে সে গুণ প্রকাশিত হয়। সে গুণগুলোর আল্লাহ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন। সূরা বাকারার প্রথম তিন আয়াত অনুযায়ী মুত্তাকীর গুণাবলি–

১। গায়েবের প্রতি ঈমান: গায়েব হলো অহীর জ্ঞান, কুরআনের জ্ঞান। কুরআন পড়া ও বিশ্বাস করা। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণ, রাসুলগণ, কিতাবসমূহ, পরকাল ও তাকদীরকে।

২। সালাত কায়েম করা: আল্লাহ যেভাবে আদায় করতে বলেছেন সেভাবে খুশু-খুযু, একাগ্রতা-নিমগ্নতা, ধীরস্থীরতা, সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে, জামাতের সাথে সালাত আদায় করা।

৩। আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকেই ব্যয় করা : ব্যয় শুধু যাকাত-পরিমান দানের মধ্যে সীমিত না রাখা। স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করা, নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুও বঞ্চিতের সাথে ভাগ করে নেওয়া। মুত্তাকী ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ আত্মীয়, প্রতিবেশি, অভাবীদের মাঝে ভাগ করে দেয়।

৪। কুরআন মাজীদ ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান : আংশিক নয়, মুত্তাকির কর্তব্য সমগ্র কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা। আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন :

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান রাখো আর কিছু অংশকে অস্বীকার করো?[19]

[১৯] সূরা বাকারা : ৮৫

যা আজ আমাদের অবস্থা। মুসলিম বিশ্বের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, কুরআনে শুধুমাত্র সালাত-সিয়ামের কথা আছে। শাসন, সংবিধান, আইন, অর্থনীতি নিয়ে যেন কুরআনের কোনো আয়াতই আল্লাহ নাযিল করেননি।

৫। পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান : পরকাল দিবসের বিশ্বাস মুত্তাকীকে তটস্থ রাখে। বিচার দিবসের প্রতিদান লাভের আশায় মুত্তাকী যেমন নেকির কাজে ধাবিত হয়, তেমনি আযাবের ভয়ে গুনাহে জড়ানোর স্পর্ধা করে না।

সূরা আল-ইমরানের আয়াত অনুযায়ী তাকওয়ার আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য–

৬। রাগ সংবরণ : রাগের মধ্য দিয়ে মানুষের পাশবিকতার প্রকাশ ঘটে, ব্যর্থতার সূচনা হয়। রাগ পরাজিত মানসিকতার লক্ষণ। তাইতো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তি তিন তিনবার উপদেশ চাইলে তিনি তিন বারই বলেন, 'রাগ করো না'।

৭। মানুষকে ক্ষমা করা : মানুষকে ক্ষমা করা, আল্লাহর কাছ থেকে নিজের ক্ষমা পাওয়ার উসীলা। মুত্তাকী ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করে যেন আল্লাহকে বলতে চায়- হে আল্লাহ! তোমার সামনে পেশ করার মতো তো আমার কোনো আমল নেই। আমি তো ক্ষুদ্র! তবুও যারা আমার অধিকার লঙ্ঘন করেছে আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি। আমার গুনাহ তো অসীম, তবে তোমার মহানুভবতার সামনে কিছুই তুচ্ছ। তুমিও আমাকে ক্ষমা করো।

৮। সদাচার করা ও সমস্ত আমল সর্বোচ্চ উত্তম পন্থায় করা। একেই বলে ইহসান। ইহসানের ব্যাখ্যা হাদীসে জিবরীল থেকেও জানতে পারি আমরা। নিঃসন্দেহে সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো রাসূলের সুন্নাহ।

৯। কোনো অশ্লীলতা বা অন্যায় করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা করে ফিরে আসা।

পাপের উপর মুত্তাকী অবিচল থাকে না। ছোট ছোট পাপ বারবার করলে আর ছোটো থাকে না। বড়ো বড়ো পাপ থেকে তাওবা করলে তাও আর বড়ো থাকে না। পাপের উপর মুত্তাকির অনুতপ্ততা ও তাওবার বনিময়ে তাওবাকারীর অনেক গুনাহকে আল্লাহ নেকিতে রূপান্তর করে দেন।

সুরা যারিয়াত অনুযায়ী মুত্তাকীর আরও কয়েকটি গুণ-
১০। রাতের কম অংশই মুত্তাকী ঘুমায়। ভোরে উঠে মুত্তাকী আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুত্তাকী নিজের পাপের বিষয়ে শঙ্কিত। সে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়। মুমিন আল্লাহ্‌র কাছে গচ্ছিত খাজানার ব্যপারে আশান্বিত। সে চায় যে কোনো মূল্যে সে খাজানা লাভ করতে। এক কথায় মুত্তাকীর ধ্যান ধারণা থাকে- কী করে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাত লাভ করবে। যে উচ্চতা চায় তাকে রাত্রি জাগরণ করতেই হয়।

১১। সূরা তাওবা অনুযায়ী মুত্তাকী সত্যবাদী খাঁটি মুমিনদের সঙ্গ গ্রহণ করে। অসৎ লোকের সাথে ওঠা-বসা মুত্তাকি ব্যক্তির সাজে না।
১২। সূরা আহযাব অনুযায়ী মুত্তাকি সঠিক কথা বলে। অহেতুক, অন্যায় কথা বলা মুত্তাকির গুণ নয়।

এছাড়াও মুত্তাকীর আরও গুণ রয়েছে। যার মাঝে মুত্তাকীর যত বেশী গুণের সমন্বয় হবে, সে তত বড় মুত্তাকী। সওমের মধ্য দিয়ে এ গুণগুলো আপনার যত অর্জন হবে, আপনার সওম ততই শক্তিশালী হবে। আপনার সওম যত দুর্বল হবে, তাকওয়া অর্জন ততই ব্যহত হবে। তাকওয়া অর্জন যত ব্যহত হবে, জান্নাতের পথ যে তত দূরে সরে যাবে।
অথভ আমরা চাই, জান্নাত নিকটে আসুক। যেন জান্নাত ও আমাদের মাঝে ব্যবধান থাকে কেবল মৃত্যু। সেজন্য মুত্তাকীর গুণগুলো অর্জন করতে হবে। তাকওয়ার অনুশীলনের জন্য রমাদান সর্বোত্তম সময়। তবে রমাদান থেকেই শুরু হোক জান্নাতকে কাছিয়ে আনার, মুত্তাকীরূপে নিজেকে গড়ে তোলার।

রমাদান: তাকওয়ার পোশাকে ক্ষমার সুসংবাদ

একজন খুনের দায়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামিকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা কী? সে বলবে, ক্ষমা।

ক্ষমার চেয়ে বড় প্রতিদান কী হতে পারে?

আমরা জাহান্নামকে কতভাবে অবধারিত করেছি। আমাদের হাতের দ্বারা, পায়ের দ্বারা, মুখের দ্বারা, চোখের দ্বারা, কানের দ্বারা, পেটের দ্বারা...এমন কোনো অঙ্গ নেই যে অঙ্গ দ্বারা আমরা গুনাহ করিনি, জাহান্নামকে অবধারিত করিনি। তাহলে আমাদের জন্য ক্ষমার চেয়ে বড় প্রতিদান আর কী হতে পারে?

হ্যাঁ, আমরা খুব সহজেই ক্ষমা পেতে পারি। আল্লাহ্ গুনাহের রাস্তা কঠিন করেছেন, অথচ আমরা নফসের উস্কানিতে সেটিকেই ভাবি সহজ। অপরদিকে আল্লাহ্ ক্ষমার রাস্তা করেছেন সহজ আর আমরা তা ভাবি কঠিন। ক্ষমা পাওয়ার এক সহজ রাস্তা হলো – তাকওয়া।

আমরা ক্ষমা পেতে পারি তাকওয়ার গুণ অর্জনের মাধ্যমে। কেননা আল্লাহ মুত্তাকীদের জন্য ক্ষমার পুরুষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। উপরন্তু পাওনা হিসাবে তিনি তাদেরকে জান্নাতেরও সুসংবাদ দিয়েছেন! অনন্ত জান্নাতের সুসংবাদ! আল্লাহ বলেন,

‘তাদের প্রতিদান হলো ক্ষমা এবং জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়’। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা দৌঁড় প্রতিযোগিতা করো ক্ষমা ও জান্নাতকে লক্ষ্য করে’।

আমরা যখন দৌঁড় প্রতিযোগিতা করি, তখন কী করি? ক্লান্ত হয়ে পরলে থেমে যাই নাকি শেষ সাধ্যটুকু পর্যন্ত চেষ্টা অব্যহত রাখি? আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য আমাদেরকে সেভাবেই চেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভের যতগুলো মাধ্যম আছে, আছে, সবগুলো পালন করতে হবে প্রতিযোগিতার সাথে।

রমাদান: তারাবীহ হোক টানাহেঁচড়ামুক্ত

তারাবীহ – বিশ্রাম। তারাবীহের সালাত বিশ্রামের সালাত। দীর্ঘ সময়ের সালাত। টানা আদায়ে বান্দার মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে, অলসতা চলে আসতে পারে – তাই প্রতি চার রাকাত পর পর বিশ্রাম নিয়ে এ সালাত আদায় করা উত্তম। তাই এর নাম তারাবীহ।

তারাবীহ আট রাকাত না বিশ রাকাত? এই প্রশ্নের উর্ধ্বে গিয়ে একটা হাদীশ আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই,

إذا كان صوم أحدكم فلا يَرْفُثْ، ولا يَصْخَبْ، فإن سابَّه أحد، أو قاتله، فليقل : إني امرؤ صائم.

তোমাদের কেউ রোযাদার হলে সে যেন কোনো মন্দ কথা না বলে এবং হট্টগোল না করে। আর কেউ তাকে কটূক্তি করলে বা তার সাথে ঝগড়া করতে চাইলে সে যেন বলে-আমি রোযাদার।[20]

রমাদানে অযথাই প্রকাশ্যে বিড়ি ফোঁকার জন্য পোলাপানের আড্ডা বসে, তাতে কারো বাধা-নিষেধ নেই। তারাবীহের জন্য কত বাহানা তাতেও বাগড়া দেয়ার কেউ নেই। অর্থাৎ, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের প্রচলন আজ বিরল। কিন্তু রমাদান এলেই এক শ্রেণীর মানুষের বিতর্কিত মনোভাব বেশ চাগিয়ে উঠে – তারাবীহ আট রাকাত না বিশ রাকাত?
অথচ রমাদানের রাত নিজের ইবাদাতের ব্যাপারে সচেতন হওয়ার রাত, অন্যের ইবাদাতের ত্রুটি অন্বেষণের সময় নয়। বেশী বেশী ইবাদাতের প্রতি যত্নশীল হওয়া রাদানের চাহিদা, ইবাদাত কমতির প্রতি নয়।

তারাবীহ বিশ রাকাৎ হওয়ার ব্যাপারে সহীহ হাদীসের বিদ্যমানতার পাশাপাশি ওমর রা. এর যামানায় ইজমা' হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকেও আমাদের জন্য অনুসৃত বলেছেন। আমি দলীলের আলোচনায় গেলাম না, আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকায়। তবে এটুকু

---

২০ সহীহুল মুসলিম: ১১৫১, সহীহুল বুখারী: ১৯০৪

অনুরোধ থাকলো, যেহেতু সবাই আমরা এখন নিজেদের জ্ঞানী ভাবি, কাজেই উভয় দিকের দলীলাদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়াশোনা করে – জেনে শুনে অনুসরণ করি।
এছাড়াও, বিশ রাকাত যদি আদায় করা হয়, তাহলে আট রাকাতও আদায় হয়েই যাচ্ছে। আর দেখুন, তারাবীহে বিশ্রামের সুযোগ তা দীর্ঘ হওয়ার জন্য। আট রাকাতই যদি তারাবীহ হয়, তাহলে তা দীর্ঘ হচ্ছে কী করে? এর চেয়ে দীর্ঘ তো যোহরের সালাত। এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'রাতের সালাত দুই রাকাত দুই রাকাত (সালাতুল্লাইলি মাসনা মাসনা)'।

একটু ভাবুন, যে ব্যক্তি জানেই না, রাতের সালাত কয় রাকাত করে পড়তে হবে, সে তো এটাও জানে না যে, মোট কয় রাকাত পড়তে হবে। এরপরও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাকাতের সাথে সীমাবদ্ধ না করে শুধু এতটুকু বলে দিলেন, দুই রাকাত দুই রাকাত। সালাফগণ এ বিষয়ে একমত যে, দীর্ঘ সময় ধরে তারাবির সালাত পড়তে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে সালাত পড়ার জন্য তো কোনো কোনো ফকীহ বিতরসহ ৪৩ রাকাতের কথাও বলেছেন। কোথায়? কখনো তো সালাফগণ একে অপরের বিরুদ্ধে বিদয়াতের অভিযোগ করেননি! বিশেষত সাহবাগণ জখন বিশ রাকাতের বিষয়ে ইজমা হয়েছেন, সেখানে এটিকে বিদয়াত বা ভুল বলার অবকাশ আছে কি?

এরপরও আপনি যদি বুঝে শুনে আট রাকাতকে সঠিক মনে করে আদায় করেন, তাহলে তা আপনার নিজের আমলের জন্য কি যথেষ্ট নয়? অন্যের উপর চাপিয়ে চেষ্টা আর বিবাদে লিপ্ত হওয়া কি উত্তম কিছু?
বিশ রাকাতকে যারা সঠিক মনে করেন, তাদের কাছেও একই প্রশ্ন, অন্যের আমলের জওয়াব কি আপনার কাছে চাওয়া হবে? আপন নিজে কি নিজের আমলের প্রতি সচেতন?
বিবাদে লিপ্ত প্রিয় ভাই ও বোনেরা! মনযোগশকারে শুনুন রাসূলের বাণী–

من ترك الكذب وهو باطل بُنِي له في رَبَض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حَسَّن خُلُقَه بُنِي له في أعلاها.

যে ব্যক্তি ভ্রান্ত অবস্থানে থেকেও মিথ্যা ত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের কোণে গৃহ নির্মাণ করা হয়। আর যে সঠিক অবস্থানে থেকে ঝগড়া পরিহার করে তার জন্য মধ্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হয়। আর যে নিজের ব্যবহারকে সুন্দর করে তার জন্য উচ্চ জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হয়।[21]

যারা বিশ রাকাত আদায় করেন, তাদের প্রতি মুফতী আব্দুল মালেক দা.বা. তিনটি অনুরোধ করেছেন। তা তুলে ধরছি –

এক. আমরা আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করি। কারণ তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে সঠিক মাসআলা অনুধাবন করার তাওফীক দিয়েছেন। আর শোকর আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, নেয়ামতের সঠিক ও যথার্থ ব্যবহার। এর অপব্যবহার কিংবা এ দ্বারা ভুল উদ্দেশ্য সাধন না করা। তাই আমাদের জন্য পূর্ণ খুশু-খুযুর সাথে নামায আদায় করা জরুরি। রুকু-কওমা (রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো), সিজদা, বৈঠক সকল রুকন ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করি। অন্যথায় আমাদের নামায মুরগির ঠোকরে পরিণত হবে, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর নিকৃষ্ট চুরি হল, নামায এত দ্রুত আদায় করা যে, রুকু-সিজদা, কওমা-জলসা ইত্যাদি রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় হয় না।

দুই. তারতীলের সাথে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা। কমপক্ষে হরফের মাখরাজ ও অপরিহার্য সিফাতগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি এবং জরুরি ওয়াকফগুলো পালন করি। কোনো শব্দ বা হরফ উচ্চারিত হল না কিংবা পার্শ্বের মুসল্লি শুনতে পেল না-এভাবে অতি দ্রুত তিলাওয়াত কখনো জায়েয নয়।

তারাবীহতে কুরআন মজীদ খতম করা সুন্নত। তবে এই সুন্নত তারাই আদায় করবেন, যারা তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করেন,

[২১] জামিউত তিরমিযী: ২১১১

তিলাওয়াতের আদবসমূহ লক্ষ্য রাখেন। অন্যথায় ছোট সূরা দিয়ে ধীর-স্থিরভাবে তারাবীহ পড়াই উত্তম হবে।
প্রকৃত তাজবীদ হল হরফগুলোর সঠিক উচ্চারণ ও ওয়াকফগুলোর সঠিক অনুসরণ। বাস্তবিকপক্ষে তাজবীদের বিধানসমূহ প্রয়োগের প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে কুরআনুল কারীম, বিশেষ করে যখন তা আল্লাহ তাআলার সামনে নামাযে তিলাওয়াত করা হয়।
তিন. রাতের শেষ ভাগ অধিক উত্তম ও বরকতপূর্ণ। এজন্য শেষরাতে তাহাজ্জুদ ও দুআর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেই। এ মাসে সাহরীর জন্য উঠার বরকতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে করতে যেন তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

আর যারা আট রাকাত পড়েন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি শায়খ উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ-এর একটি বাণী উল্লেখ করছি–

আমাদের সালাফগণ ইখতিলাফ করতেন অন্তরের মিল অক্ষুণ্ন রেখে। আমরা ইখতিলাফ করি অন্তরের মিল নেই বলে।

প্রিয় ভাই/বোন, আমরা যে এমন না হয়। সুন্নাহ নিয়ে ইখতিলাফ করতে গিয়ে ঐক্যের ফরয যেন আমাদের ছুটে না যায়। রমাদানের প্রাণ হলো গুনাহ বর্জন করা আর সেই রমাদানকে ঘিরেই যদি উপচে উঠে বিবাদ আর বিতর্কের আগুন, তবে সে আগুনে জ্বল্বো আমরা সকলেই। বরং, আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত সে আগুন থেকে প্রাণপণ বেঁচে থাকা। তারাবীহের নামাযে দাঁড়িয়ে রবের কাছাকাছি হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা। ক্ষমা আর মুক্তির ঘোষণার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা। তবেই আমাদের জন্য এ সুসংবাদ –

من قام رمضان ايمانا و احتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রমজান মাসে রাত্রি জাগরণ করে তারাবীহ নামায আদায় করবে, তার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।[22]

---

২২ সহীহুল বুখারী:৩৭

রমাদান: ভালোবাসার নযরানা

ভালোবাসা। এক অদ্ভুত শব্দ। তারচে'ও অদ্ভুত তার অনুভব। ভালোবাসা এমন এক অনুভূতি, যে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে অন্তরের গহীন থেকে গহীন, গভূর থেকে গভীর কোণেও।
যাকে ভালোবাসা হয়, ভালো লাগে তাকে ভাবতে, ভালো লাগে তার মতো করে নিজেকে সাজাতে, ভালো লাগে তাকে বুঝাতে পেরে, আমি তোমাকে ভালোবাসি!
ভালোবাসা যদি হয় ভালোবাসার মালিকের প্রতি, অদ্বিতীয় অতুলনীয় সত্ত্বার প্রতি সে ভালোবাসা পায় ভিন্ন মাত্রা, ভিন্ন রঙ, ভিন্ন স্বাদ। সে ভালোবাসাই প্রকৃত, খাঁটি। সে ভালোবাসাই অনন্ত সঙ্গী, স্থায়ী অনুভূতি।

আল্লাহর প্রেমী কখনো নিঃসঙ্গ হয় না, হরপল রব সঙ্গ দেন তাকে। কত সুন্দর করেই না বলছেন হাবীব আবূ মুহাম্মাদ (রহ.), যদি তোমার দ্বারা কারো চোখ না জুড়ায়, তার আর কিসের চোখ জুড়োনো তোমার সঙ্গ যে অনুভব করেনা তার আবার কিসের সঙ্গ!'

সে প্রেমসুধায় আকুল হয়েই নবুওয়তের আগে দিনের পর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ে থাকতেন গারে হেরায়, নবুওয়তপ্রাপ্তির পর সহস্র রজনী কাটিয়ে দিয়েছেন অতি সামান্য নিদ্রায়।
যে চোখ স্থায়ী প্রেমের রূপ দেখেছে, সে চোখ কী করে ঘুমে তৃপ্ত হতে পারে! যে হৃদয় প্রকৃত ভালোবাসায় আকুল হয়েছে, সে হৃদয় কী করে তৃপ্ত হতে পারে! ইচ্ছে জাগে, কেটে যাক ক্ষণ-বহুক্ষণ, কাল-বহুকাল এ ভালোবাসার সুধা পিয়ে!

ভালোবাসার মালিক জানেন ভালোবাসার এ অতৃপ্তি! তৃষ্ণার আকুতি! তাই তো, প্রকৃত ভালোবাসাকে করেছেন মৃত্যুর পরও দীর্ঘস্থায়ী। আর দুনিয়াতে ভালোবাসায় ডুবে থাকাকে করেছেন অজস্র সওয়াবের আকাঙ্ক্ষী।

ভালোবাসার এক ছোট্ট নমুনা ই'তিকাফ। ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা। কোথায়? ছেলেরা মাসজিদে, মেয়েরা বাসার সালাতের স্থানে। নির্দিষ্ট জায়গা না থাকলে, কোনো এক জায়গা নির্দিষ্ট করে। কেন?
- রবের একান্ত সান্নিধ্যের অনুসন্ধানে, একটি সুন্নাহ পালনের নিয়তে। তবে সে অবস্থানের কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ফিকহের কিতাবে আছে বিস্তারিত। সংক্ষেপে একটু শুনুন–

১। বাথরুম, খাবার ইত্যাদি মানবিক প্রয়োজনে ই’তিকাফের স্থান থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে। তবে যে সমস্ত কাজ ইতিকাফের স্থানে থেকেই সম্ভব, সেসবের জন্য বের হওয়ার অনুমতি নবেই। যেমন- খাবার দিয়ে যাওয়ার মতো কেউ থাকলে খাবারের জন্য বের হওয়ার অনুমতি নেই।

২।। ই'তিকাফরত অবস্থায় অনর্থক কথার তুলনায় চুপ থাকা উত্তম। চুপ থাকার চে' কল্যাণকর কথা বলা উত্তম। কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দুরূদ আর দ্বীনী কথার বাইরে অন্য কথা তো কতই হয়, ইতিকাফের দিন ক'টা নফসের শাসন চলুক না!

আমাদের সালাফগণ সে সময় দ্বীনী মাজলিস করতেন। সাধারণ জনগণ তাঁদের কাছে পেতেন আত্মার খোরাক। সালাদফগণের অনুসরণে এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদে ই’তিকাফরত অবস্থায় দ্বীনি হালাকা হয়ে থাকে।

৩। ই’তিকাফরত অবস্থায় ঘুমানো যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, এ অবস্থান শুধু ঘুমানোর জন্যে নয়। বরং ইবাদতে ও তাঁর ভালোবাসায় মগ্ন থাকার জন্য, যিনি নিদ্রা-তন্দ্রার উর্ধ্বে।

৪। ই’তিকাফরত অবস্থায় সওম ভেঙ্গে গেলে ইতিকাফও ফাসেদ হয়ে যায়। অপ্রয়োজনে সে স্থান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ অন্যত্র অবস্থানের দ্বারাও তা ফাসেদ হয়ে যায়।

রমাদানের শেষ দশ দিন আল্লাহর রাসূল ই'তিকাফ করতেন। স্বীয় রবের প্রেমসুধায় আকুল হয়ে দিন গুজরান করতেন। কয়েকটি দিন! শুধুই প্রেমময় সত্ত্বার সাথে! কয়েকটি দিন! দুনিয়ার সবকিছু

থেকে ছুটি নিয়ে অপার্থিব অনুভূতি সঙ্গী করে। কয়েকটি দিন! নিজের মাঝের নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্য!

কতই না ভাগ্যবান তারা, যারা ই'তিকাফের মর্ম ছুঁয়ে করতে পেরেছে দিন গুজরান! প্রকৃত অর্থেই প্রভুর ভালোবাসা হৃদয়ে জাগাতে করেছে অবস্থান। রবের জন্য আপনি সময় কুরবান করবেন আর রব তা অযথাই রেখে দিবেন? তা কখনোই হতে পারে না! তিনি যে শাকূর - প্রতিদানদাতা।

রমাদান: হাজার রাতের চেয়ে উত্তম যার 'একটি' রাত

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণের একটি মাজলিস। মজলিসে সাহাবিগণ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দার মুখে শুনছিলেন এক গল্প। সত্য গল্প। পূর্ববর্তী উম্মাতের এক আল্লাহভক্তের গল্প। যিনি সহস্র দিন, সহস্র রাত কাটিয়ে দিয়েছেন রবের পথে, জিহাদের ময়দানে। তাঁরা শুনছিলেন আর আফসোস করছিলেন!

অবশেষে প্রিয় মানুষটিকে তাঁরা বলেই ফেললেন সে আফসোসের কথা, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো এখন এত বছর হায়াতও পাই না। তারা তো এগিয়ে গেলো'। রাসূলেরও হয়তো কষ্ট লেগেছিলো প্রিয় সহচরদের এই আফসোসে। তাঁদের আফসোস এতটাই খাঁটি ছিলো যে, আরশে আজীম পর্যন্ত পৌঁছে গেলো সে দীর্ঘশ্বাস। আল্লাহ্ সে আফসোস ফিরিয়ে দিলেন আনন্দের বারতায় পালটে। বান্দাদের হাদিয়া দিলেন এমন 'একটি' রাত, যা সহস্র রজনী থেকেও উত্তম - **লাইলাতুল কদর, 'তাকদীরের রাত'।**
যে রাতে দলে দলে ফেরেশতারা দুনিয়াতে নেমে আসে। যে রাতে জিবরাঈল আ.ও দুনিয়াতে আসেন। সাথে নিয়ে আসেন রবের 'আদেশ'। সকল বিষয়ের আদেশ। আগামী লাইলাতুল কদর পর্যন্ত সমস্ত বান্দাদের ভাগ্যলিপি। সারারাত চলে ফেরেশতাদের এই

অবতরণ এবং সারারাতই চলে আসে অভিবাদন – ‘সালাম, সালাম......’।
সুবহে সাদিক যখন শুরু হয়, দিগন্তে ভেসে উঠে নতুন একটি দিনের আলোকরেখা, এই অবতরণ থেমে যায়। সে মুবারাক রাত্রি শেষ হয়ে যায়। থেকে যায় সে রাতে করা আমলগুলো আর বরকতের সময়গুলো।

কুরআনে পুরো একটি সূরাই নাযিল হয়েছে এ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে, তার নামও ‘সূরাতল কদর’ –

নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
তুমি কি জানো, কদরের রাত কী?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
‘কদরের রাত’ সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে।	تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
শান্তিময় সেই রাত—যতক্ষণ না ফজরের উদয় হয়।	سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

আসুন, আরও শুনি। এ রাত জেগে থেকে ইবাদাতের রাত। এতে হবে সগীরাহ গুনাহের মোচন। আল্লাহর হাবীব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল কদরে ‘ইবাদাতে কাটাবে তারও আগের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে।[23]

এ রাত কল্যাণ লাভের রাত। কল্যাণ থেকে বঞ্চিতরাই কেবল এ রাত থেকে বঞ্চিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوم

তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়।[24]

সে রাত কোন রাত, যে রাত এত বরকতময়? যে রাত এত শান্তিময়?
সে রাত রমাদানের এক রাত। শেষ দশকের এক রাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহকে এ রাতের নির্দিষ্ট সময় জানানোর জন্য ঘর থেকে যখন বের হলেন, দেখতে পেলেন দু’জন লোক ঝগড়া করছে। তিনি ভুলে গেলেন সে নির্দিষ্ট রাত। হাদীসে রয়েছে,

خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ " خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ "

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের (নির্দিষ্ট তারিখ) অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন দু ’ জন মুসলিম ঝগড়া করছিল। তা দেখে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল

[২৩] সহীহুল বুখারী: ১৮০২

[২৪]সুনানু ইবনি মাজা: ১৬৪৪

ক্বাদ্‌রের সংবাদ দিবার জন্য বের হয়েছিলাম, তখন অমুক অমুক ঝগড়া করছিল, ফলে তার (নির্দিষ্ট তারিখের) পরিচয় হারিয়ে যায়। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তা তালাশ কর।[25]

এ হাদীসে যেমন আছে নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতের কথা। অন্য হাদীসে আবার আছে সকল বেজোড় রাতের কথা। কোথাও আছে সুনির্দিষ্টভাবে সাতাশতম রাত্রির কথা। কোথাও আছে শেষ দশকজুড়েই লাইলাতুল কদর অন্বেষণের তাকীদ।

সতর্কতা এটাই। আগ্রহীরা শেষ দশক জুড়েই ইবাদাতে অধিকহারে মশগুল হয়ে যায়। বলা তো যায় না, যে রাতটা আলসেমি করে ঘুমিয়ে কাটানো হলো, সেটাই যদি লাইলাতুল কদর হয়ে যায়? তাই আয়শা রা. বলেন, ‘যখন (রমযানের) শেষ দশক উপস্থিত হত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লুঙ্গি শক্ত করে বাঁধতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন ও পরিবারের সদস্যদের জাগিয়ে তুলতেন’।[26]

এত এত গুরুত্ব ও স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি হাদীসে সে রাতের কিছু আলামতও বলে দেয়া আছে। সে রাত হবে–

* পূর্ণিমা রাতের মত। গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে না।

* নাতিশীতোষ্ণ হবে। অর্থাৎ গরম বা শীতের তীব্রতা থাকবে না।

* মৃদু বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে।

* সে রাতে ইবাদত করে মানুষ অপেক্ষাকৃত অধিক তৃপ্তিবোধ করবে।

* কোনো ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ স্বপ্নে হয়তো তা জানিয়েও দিতে পারেন।

* সে রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হতে পারে।

* সকালে হালকা আলোকরশ্মিসহ সূর্যোদয় হবে। যা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত। [27]

---

[২৫] সহীহুল বুখারি : ৬০৪৯

[২৬]সহীহুল বুখারি: ১৯২০, সহীহুল মুসলিম: ১১৭৪

[২৭] সহীহু ইবনি খুযাইমা : ২১৯০; সহীহুল বুখারি : ২০২১

একটু ভাবুন তো!
পূর্ণিমা রাতে আকাশের নীচে জায়নামাযে একনিষ্ঠ, নিবিষ্ট চিত্তে আপনি দন্ডায়মান রবের সামনে। একদিকে মৃদু বাতাস তনু-মন শীতল করছে, আরেকদিকে অনুতপ্ত অন্তর থেকে উঠে আসা অশ্রুকণা আপনার কপোল ভিজিয়ে দিচ্ছে। অস্ফুট আহাজারি নাছোড়বান্দার মত কড়া নাড়ছে রহীমের দয়ার দুয়ারে।
এক সংকল্পে বারবার দৃঢ় হচ্ছে চোয়াল – ক্ষমা না নিয়ে আজ ফিরবো না যে! সবটকু অসহায়ত্ব নিয়ে, পুরো হৃদয়কে শূন্য করে একদম গভীর থেকে উঠে আসছে একটি আওয়াজ – আল্লাহ্! মাফ করে দাও!
আল্লাহ্! মাফ করে দিবে না? ইন শা আল্লাহ্!

সওম: পৃথিবীর শুরু থেকে চলে আসা ইবাদাত

পৃথিবীর শুরু থেকেই রবের আদেশে সওম পালন করছে মানুষ। তা যেমন উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য ফরজ ,তেমনি ফরজ ছিলো উম্মাতে আদম আ., উম্মাতে নূহ আ., উম্মাতে ইবরাহীম, উম্মাতে মূসা আ., উম্মাতে ঈসা. সহ সব আম্বিয়ায়ে কেরামের উম্মাতের জন্যও। তবে ধরণ ছিলো ভিন্ন, পালনের স্বরুপ ছিলো ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

‘তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে ,যেমন ফরজ করা হয়েছিলো পূর্ববর্তীদের উপর ;যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।’

কেমন ছিলো তাঁদের সওম? আদম আলাইহিস সালাম-এর এর সময়ে সওমের স্বরূপ কী ছিলো, তা নিয়ে মতভেদ আছে বিস্তর। কেউ বলেছেন, নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর তা আদম আলাইহিস সালাম-এরর উদরে তিরিশ দিন ছিলো। তাই তিনি তিরিশ দিন সওম পালন করেন।
আবার কেউ বলেন, আদম আ. ও হাওয়া আ. দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পরষ্পরের কাছাকাছি হওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। এটাও এক ধরণের সওম।

দাঊদ عليه السلام এর সওম সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। তাঁর সওমকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পছন্দনীয় সওম (নফল) হিসেবেও অভিহিত করেছেন। সুনানু ইবনু মাজাইয় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘সওমসমূহের মধ্যে দাঊদ عليه السلام এর সওম আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তিনি এক দিন সওম করতেন এবং পরবর্তী দিন সওম করতেন না। আল্লাহর নিকট দাঊদ عليه السلام এর সালাত অধিক প্রিয়। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ সালাতে কাটাতেন এবং আবার এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন।[28]

মূসা আ. এর সওম ছিলো আশুরা তথা মুহাররমের দশ তারিখ। হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে এ দিনে সওম রাখতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ কিসের সওম। তারা বলেছিলো, এ দিন মূসা عليه السلام ফেরাউনের কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন ও তারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। তাই মূসা عليه السلام সেদিন সওম রাখতেন। রাসূল ﷺ তখন বলেছিলেন, ‘ইয়াহুদীদের থেকে আমরা মূসা عليه السلام এর ব্যাপারে অধিক হকদার।

তিনি আশুরার দিন সওম পালন করেন এবং অন্যান্যদেরও এ দিন সওম পালন করতে বলেন। তিনি আরও একটি দিন বৃদ্ধি করে সওম করতে বলেন, যেন ইয়াহুদীদের সাথে ব্যতিক্রম হয়।[29]

---

২৮ সুনানু ইবনে মাজাহ-১৭১২

২৯ সহীহুল বুখারী১৫৯২-

এভাবেই, সওম যেমন আছে এখন, ছিলো পূর্বেও, থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত।

রূহুল মাআ'নীতে (২/৫৬) রয়েছে, সওম এমন একটি ইবাদত, যা বাহ্যত কষ্টকর হলেও তার প্রচলন ছিল সর্বকালে। হযরত আদম আ.-এর যুগ থেকে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর উম্মতের উপরই তা ফরয ছিল।

মাআরিফুস সুনানে (৫/৩২৩) আছে, পূর্ব যুগে সওমর ধরন ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির। সওম রাখার পদ্ধতির ভিন্নতা ছাড়াও ফরয সওমর সংখ্যাও বিভিন্ন রকম ছিল। প্রাথমিক অবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদীর উপরও কেবলমাত্র আশুরার সওম ফরয ছিল। রমাদানের সওমর ফরয বিধান আসার পর আশুরার সওম ফরয হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যায়।

কতটা গুরুত্বপূর্ণ হলে এক বিধান চলছে পিতা আদম ﵇ থেকে, চলবে উম্মাতে মুহাম্মাদীর খাতেমা অব্দি! আমরা এ গুরুত্ব যেন দেখেও দেখি না! মেনেও মানি না!

সওম: তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম

সব কাজের জন্য একটা মাধ্যম প্রয়োজন হয়। ধরুন, ফুফুর বাড়ী যাচ্ছেন। বেশ দূরের পথ। অবশ্যই আপনাকে একটা বাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিংবা ধরুন, বড় কোম্পানীতে জব পাওয়া আপনার লক্ষ্য। সেজন্যে আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে, স্কুলে যেতে হবে ইত্যাদি।

তেমনি তাকওয়া অর্জনের জন্যও কিছু মাধ্যম আছে। যেগুলোর কারণে তাকওয়া অর্জন সহজ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু তাকওয়াকে অপরিহার্য করেননি, অপরিহার্য করেছেন সে সমস্ত আমলকেও, যেগুলো তাকওয়া অর্জনে সহায়ক হয়।

তাকওয়া অর্জনের পর তাকওয়ার পথে অবিচল থাকার জন্যও কিছু আমল প্রয়োজন হয়, আল্লাহ্ সেগুলোকেও অপরিহার্য করেছেন।

তাকওয়া অর্জন সহজ হওয়ার জন্য একটি জরুরী আমল হলো, সৎসঙ্গ। সঙ্গের প্রভাব মানুষের মাঝে পরিলক্ষিত হয় অত্যন্ত প্রকটভাবে। সেজন্যই বন্ধুত্ব নির্বাচনে সতর্ক হওয়াও ইসলামের একটি নির্দেশনা। সৎসঙ্গকে অপরিহার্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।[30]

যখন কেউ সত্যবাদীদের সাথে থাকবে, তারে মাঝেও সত্যবাদীতার গুণ ফুটে উঠবে। তাতে তাকওয় অর্জন সহজ হয়ে যাবে।

তাকওয়ার উপর অবিচল থাকার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো আল্লাহ্র আলোচনা, স্মরণ ও তাঁর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ বলেন,

---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

'তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো'।[31]

আয়াতটির আরেকটি অর্থ হতে পারে – 'তোমরা আল্লাহ্র বেশী বেশী যিকির করো'।

আরেকটি অর্থও হতে পারে– 'তোমরা আল্লাহ্র বেশী বেশী আলোচনা করো'।

বস্তুত সবগুলো অর্থেই আল্লাহকে স্মরণ করতে বলা হচ্ছে। মনে মনে, সাথে সাথে যবানে উচ্চারণ করে এবং জনসমাগমে আলোচনা করে। তাকওয়ার জন্য সব ধরণের স্মরণই জরুরী।

---

৩০ সূরা তাওবা : ১১৯

৩১ সূরা আহযাব : ৪১

তাকওয়া ও সিরাতুম মুস্তাকিমের উপর অবিচল থাকার পথে প্রবৃত্তি বড় বাঁধা। আমাদের সালাফগণ বলতেন, মানুষ জখন বেশী খায়, বেশী ঘুমায় তখন বিবেক ভোতা হয়ে জয়ায়, নফস তখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই তাঁরা অধিক খেতে ও অধিক ঘুমাতে নিষেধ করতেন।

সওম আমাদেরকে প্রবৃত্তিকে দমন করতে সহায়তা করে। সিয়াম অর্থ বিরত থাকা। পানাহার, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা। অনাহার ও নফসের চাহিদা পূরণ না করার দ্বারা প্রবৃত্তি দমিত হয়, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। মানুষ যখন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে তখন তাঁর মাঝে নেকির কাজ করার শক্তি ও আগ্রহ সঞ্চিত হতে থাকে।

সেজন্যই তাকওয়া অর্জনের সহজ পন্থা এই সিয়াম। প্রবৃত্তির তাড়নার দুর্বলতায় সহজ হয়ে ওঠে আল্লাহভীরুতার চর্চা।

কিন্তু আমাদের সিয়াম প্রবৃত্তি দমনে সহায়তা করে না, কারণ সিয়াম করার দ্বারা পানাহার থেকে বিরত থাকলেও বিরত থাকা হয় না গুনাহ থেকে।

টিভি চলে আগের মতোই, পুরুষ দেখছে নারীর ছবি, নারীরা দেখছে পুরুষের ছবি, ফ্রি মিক্সিং, জাহান্নামি পরিবেশে শপিং, গীবত, পরনিন্দা, ঝগড়া, পারষ্পারিক বিরোধিতা কোনো কিছু থেমে থাকে না।

সিয়ামের ন্যূনতম দাবি যে– পানাহার নিয়ন্ত্রণ করা, তাও হয় না। শুধু সময়টা পালটে যায়। সকালে খেতে পারে না বলে সন্ধ্যা থেকে রাত অব্দি খাওয়ায় ডুবে থাকা। ভোর রাতে সাহরি খাওয়া সুন্নাহ, কিন্তু সুন্নাহ না মেনে দুপরের খাবারটাও যেন অর্ধেক পুষিয়ে নেওয়া হয়। আর যতটুকু পোষাতে বাকি থাকে, কাফফারাসহ ইফতারিতে তা আদায় করে নেয়। এমনকি এ জাহেলি সমাজে প্রচলিত আছে- রমাদানে খাবারের নাকি কোনো হিসাব নেই!

আফসোস!

যে মাস ছিল অনাহারের মাস, সে মাস হয়েছে খাবারের মাস। দিনের যে সময়টুকুতে অনাহারে থাকা হয়, সে সময়টুকুতেও যেন

কষ্ট না হয়, তাই ঘুমিয়ে কাটানো হয়। অথচ সিয়ামের সময়টুকু ছিল–

- গুনাহ থেকে বিরত থাকার অনুশীলনীর জন্য
- বেশী বেশী নেকির কাজ করে মুত্তাকির গুণ অর্জনের প্রচেষ্টায় রত হওয়ার জন্য
- মুত্তাকি হয়ে যেন কুরআনকে হুদানরূপে গ্রহণ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে বেশী বেশী কুরআন অধ্যায়ণ ও অনুধাবনের জন্য।

প্রিয় পাঠক, সিয়ামকে তাকওয়ার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হলে, আমাদের উচিৎ–

– রমাদানে ঘুম কমিয়ে দেওয়া
– কম কম খাবার খাওয়া
– সালাত, তিলাওয়াত, গরীবকে আহার দানসহ মুত্তাকির যত গুণাবলি আছে, সে কাজগুলো বেশী বেশী করা
– মুত্তাকীর ব্যক্তিত্ব পরিপন্থী সমস্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

প্রিয়, পাঠক!

সিয়ামকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য খাওয়া-দাওয়া, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো বৈধ কাজগুলো অবৈধ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে অবৈধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা সিয়ামকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য কতটা অপরিহার্য!

আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে নতি স্বীকার করে শারীরিক চাহিদার বৈধ কাজগুলো থেকে যখন বিরিত থাকি, এর দ্বারা আসলে আল্লাহর আদেশ ও কুরআন-হাদীসের আদেশ নিষেধ মানার একটা যোগ্যতা গড়ে ওঠে।

সবই আল্লাহ্‌র দয়া! মুমিনকে মুত্তাকীরূপে গড়ার জন্য আল্লাহর অসীম করুণা! তাই তো সিয়াম শারীরিকভাবে কিছুটা কষ্টের হলেও এর দ্বারা যে শ্রেষ্ঠত্ব ও তাকওয়ার সম্পদ অর্জিত হয়, তার সামনে সিয়ামের কষ্ট কিছুই না। আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

'তিনি তোমাদের জন্য সহজতা চান, কাঠিন্য চান না'।[32]

তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সহজতম মাধ্যমই হলো সিয়াম। বিশেষত রমাদানে যখন শয়তান বন্দী, নেকির সাওয়াব বাড়িয়ে করা হয়েছে শতগুণে বৃদ্ধি, তখনও যদি আমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে না পারি, সওমকে সওমের মতো করে পালন করতে না পারি, তবে আর কবে?

[৩২] সুরা বাকারা : ১৮৫

সপ্তম: রিয়ার সংশয়বিহীন এক ইবাদাত

আবেদের এক শত্রু আছে। চোখের সীমায় যার অবস্থান অনুপস্থিত, কিন্তু মনের অভ্যন্তরে সে বড় বেশী উপস্থিত, প্রচন্ড রকম প্রভাবশালী। সে শত্রু হলো, রিয়া। লৌকিকতা। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

'আমি তোমাদের ব্যপারে সবচেয়ে ভয় পাই শিরকে আসগার। আর তা হলো লৌকিকতা।[33]

এই রিয়ার এক ভাই আছে। সময়ে সময়েও সেও সঙ্গ দেয় তাকে। দুইয়ে মিলে পরিণত হয় শয়তানের শক্তিশালী অস্ত্র। আল্লাহর সাহায্য ও ঈমানের শক্তি ছাড়া যে শক্তির মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। রিয়ার সে সঙ্গীর নাম–কিবর,তাকাব্বুর, অহংকার। অহংকার নেক আমল সমূহকে সেভাবেই জ্বালিয়ে দেয় যেভাবে আগুন শুকনো পাতাকে জ্বালিয়ে দেয়। দুইয়ের সম্পর্ক এমন, যেন রিয়া আমলগুলোকে মৃতপ্রায় শুকনো পাতায় পরিণত করে আর কিবর আগুন হয়ে সে পাতাগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়।

আপনার আশেপাশে অনেকেই সালাততরককারী, সালাত সম্পর্কে বেখবর, এদের মাঝে আপনিই সালাত সম্পর্কে সচেতন, চেষ্টা করেন প্রতি ওয়াক্তেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে। আপনার মন চাইতে পারে, সবাই দেখুক আমি সালাত পড়ি, আমার প্রশংসা করুক। এই চাওয়ার নাম লৌকিকতা, রিয়া। আপনি ভাবতে পারেন, চারপাশের এত বেখবর লোকজনের মাঝখানে আপনিই যত্নশীল, আপনিই ভালো। এই ভাবনার নাম অহংকার।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। সাথে আপনার বন্ধু। একজন ভিক্ষুক এলো। বন্ধুর সামনে তাকে কিছু না দেয়াটা কেমন দেখায়! এই কেমন দেখানো অনুভূতির নাম রিয়া, লোকদেখানো।

---

৩৩ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ১/৫২

আবার ভিক্ষুককে দিয়ে ভাবছেন, এতজনের মাঝে আমিই দিলাম। আর কেউ দিলো না। এর নাম কিবর, অহংকার। যদি এসব ভাবনা ও অনুভূতি না-ও থাকে, তবু কারো সামনে সালাত আদায় করলে বা কোন ইবাদাত করলে যেন মনটা খুঁতখুঁত করতেই থাকে, রিয়া হয়ে গেলো না তো! মনে কিবর জন্ম নিলো না তো! এটা ওয়াসওয়াসা। শয়তান আপনার মনে এ ওয়াসওয়াসা তৈরি করে দেয়, যেন সামনের দিনগুলোতে আপনাকে আমল থেকে বিরত রাখতে পারে; রিয়া ও কিবরের আশংকায় আপনি যেন কারো সামনে আর আমল না করেন। এভাবে ধীরে ধীরে আপনার আমল কমে যাবে।

সাবধান! শয়তানের এ ওয়াসওয়াসার ফাঁদে পা দিবেন না। আন্তরিকভাবে করা ইবাদাত নিশ্চই রবের কাছে কবূলের মর্যাদা পাবে! অবশ্যই পাবে! ইন শা আল্লাহ্!

কিন্তু ভাবুন তো, এক আমল– যাতে ইচ্ছে করে রিয়া করা ছাড়া রিয়ার সম্ভাবনা নেই। নিজে থেকে কিবর আনা ছাড়া আসার সম্ভাবনা নেই।

সওম! এ এমনই এক আমল। এতে রিয়া নেই। কারণ, আপনি খাচ্ছেন কি খাচ্ছেন না, তা কেউ দেখছে না।

এতে কিবর নেই। কারণ, আপনার সামনে না খেয়ে থাকা ব্যক্তিটিও তো সায়েম হতে পারে। তবে আর আপনি উত্তম কেন?

আবার আপনি যদি সওম পালন নাও করেন, তবুও তো কেউ জানছে না, লোকলজ্জায় পড়তে হচ্ছে না। এরপরও আপনি সওম ভঙ্গকারী সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকছেন, কেন? আল্লাহর জন্য। তাঁকে পাওয়ার মানসে। এরই নাম খুলূসিয়্যত, ইখলাস–কেবলই আল্লাহর জন্য করা আমল। ইখলাস অর্থ নিয়ত খাঁটি করা, কোন কিছু দুনিয়াবী স্বার্থবিহীনভাবে আদায় করা। সওমে এ অর্থ পাওয়া যায় পুরোপুরিভাবে, যদি না আপনি স্বেচ্ছায় একে কলুষিত করেন।

সওম, ইখলাসের নমুনা। শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করা এক ইবাদাত। যতে নেই রিয়া, নেই কিবর। এজন্যই বুঝি কেবল রবই হবেন এর প্রতিদান! মাসভর ইখলাসের এ অনুশীলনে যদি থাকে

প্রত্যয়, তবে তা প্রস্ফুটিত হবে আমাদের অন্যান্য ইবাদাতেও ইন শা আল্লাহ!

সওম: সংকল্প হোক গুনাহবিহীন দিন যাপনের

সওম ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। খুঁটিহীন যেমন তাঁবু হয় না, তেমনি এই পঞ্চস্তম্ভহীন ইসলাম পালনও সম্ভব না। আবার কোন একটি খুঁটি যত নড়বড়ে হবে, তাঁবুও ততটাই দুর্বল হবে। তেমনি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের কোন একটির দুর্বলতা, নড়বড়ে করে দিবে আমাদের ইসলাম পালনকেও।

পঞ্চস্তম্ভের একটি হলো এই সওম। সওমও দুর্বল হয়, ত্রুটিপূর্ণ হয়। এতে দুর্বল হয় আমাদের ঈমান, ইসলাম পালন। সওমকে দুর্বল করে দেয় আমাদের কৃতকর্মই, আমাদের হাতের কামাই-ই। কী আফসোসের কথা না?
ক্ষুধা লাগলো তবুও পছন্দের আইসক্রিম কিংবা চিকেন ফ্রাই অথবা মায়ের হাতের রান্না কিছুই খাওয়া হলো না, ঘুম থেকে উঠে কখনোবা তৃষ্ণায় কাতর অথবা গলা শুকিয়ে কাঠ, তবুও পানি থেকে দূরে থাকা হলো, সব কষ্ট অযথাই!

রাত্রি জাগরণ হলো কিংবা দু'মুঠো খেতে পূর্ণ ঘুম থেকে উঠে যেতে হলো, এই কষ্ট স্বীকার খামোকাই!
এই কষ্টকে নিষ্ফল করছি কিন্তু আমরাই!
কী করে? গুনাহের মাধ্যমে অন্তরকে কলুষিত করে। গুনাহ যেমন অন্তরে একটি দাগ ফেলে দেয়, তেমনি ইবাদাতের স্বাদকেও নষ্ট করে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন -

---

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি (সওম অবস্থায়) মিথ্যাচারিতা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করেনি, তার পানাহার পরিত্যাগের কোনোই গুরুত্ব নেই আল্লাহর কাছে।[34]

তবে কার জন্য সওম? কার জন্য এ স্বেচ্ছা-কষ্ট?
অন্য হাদীসে রয়েছে–

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

সওম অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন কোনো অশ্লীল ও মন্দ কথা না বলে। যেন কোনো শোরগোল ও হট্টগোল না করে। যদি কেউ তাকে কটুকথা বলে কিংবা তার সাথে মারামারি করে, তবে সে যেন এতটুকু বলে দেয়–আমি সায়েম, রোযাদার।[35]

অশ্লীল কথা বা মন্দ কাজই না শুধু, ছাড়তে হবে অন্যান্য গর্হিত কাজও। ছাড়তে হবে–
যবানের গুনাহ–মিথ্যে বলা, গীবত করা, একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ানো, অপবাদ দেয়া, হারাম খাবার খাওয়া ইত্যাদি;
চোখের গুনাহ–মুভি দেখা, গাইরে মাহরামের ছবি বা ভিডিও দেখা, গাইরে মাহরামের দিকে স্বেচ্ছা দৃষ্টিপাত, অন্যের সতরের দিকে দৃষ্টিপাত ইত্যাদি;
হাতের গুনাহ– কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা, হাতের মাধ্যমে কোন অশ্লীল বা তাচ্ছিল্যমূলক ইঙ্গিত করা, না জায়েজ কিছু লিখা, গান, গাইরে মাহরামের কল্পনায় বা গাইরে মাহরামের উদ্দেশ্যে কিছু লিখা, গীবত করে বা অন্যায়ের প্রতি প্ররচণামূলক কিছু লিখা ইত্যাদি;
অন্তরের গুনাহ–মনে মনে কোনো গাইরে মাহরামকে নিয়ে ভাবা, হিংসা–বিদ্বেষ–অহংকার–রিয়া–অধিক উচ্চাশা ইত্যাদি।

সওম অর্থই বিরত থাকা। এর এক উদ্দেশ্য যেমন পানাহার ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থাকা, তেমনি আরেক উদ্দেশ্য হলো

---

[৩৪] সহীহুল বুখারী, হাদীস ১৯০৩

[৩৫] সহীহুল বুখারী, হাদীস ১৯০৪

গুনাহ পরিহার করা। প্রথম উদ্দেশ্য প্রাপ্তিতে সওম পূর্ণতা পায় আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের প্রাপ্তিতে প্রতিদানের দাবী মজবূত হয়।

সওমের প্রতিদান কী জানেন? স্বয়ং আল্লাহ্! যখন সওমের উভয় উদ্দেশ্যই পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ আমাদের হয়ে যাবেন! আর আল্লাহ্ যার জন্য হয়ে যান - সে কী চায়, যা পায় না? আর কী পাওনা আছে, যা অপূর্ণ? সব, সব কিছুই যেন তার জন্য প্রস্তুত সদা-সর্বদা! তবে কেন গুনাহের কালিমায় অন্তরকে করবো অন্ধকারাচ্ছন্ন?

আসুন, গুনাহ বর্জন করি। গুনাহ বর্জনের একটি কার্যকরী পদ্ধতি হলো, আগে নিজের গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া। প্রথমে নিজের গুনাহগুলো ভেবে বের করুন। এরপর একটি ডায়রী নিন। তাতে সে গুনাহগুলো একে একে লিখতে থাকুন। সবগুলো গুনাহ যখন লিখা হয়ে যাবে, তখন আলাদা পেইজে উপর নীচ করে সে গুনাহগুলো একটি একটি করে লিখুন। এরপর প্রতিদিন যখনই গুনাহ হয়ে যাবে অথবা মনে পড়বে, তখনই টিক অথবা ক্রস চিহ্ন দিন আর দৃঢ় সংকল্প করুন, যেন টিক চিহ্ন দিতে না হয়। এভাবে মাসভর হোক অনুশীল বিশুদ্ধতার, এ অনুশীলনের সুফল রবে সারাবছর ইন শা আল্লাহ্।

সওম: সবরের মাদরাসা

সবর অর্থ কী? ধৈর্য।
কিসের উপর ধৈর্য?
উলামায়ে কেরাম সবরকে বিভক্ত করেছেন অনেক প্রকারে। তিনটি প্রকার সর্বাধিক আলোচিত হয়–
১. আস সাবরু আলাত ত্বাআহ: আনুগত্যের উপর সবর। আপনার নফস আপনাকে বলছে, আমি ঘুমিয়ে থাকুন। আরাম করুন। তবু আপনি উঠে নামায পড়ছেন। মন চাইছে, একটা গল্পের বই পড়ুন। আপনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন। এরপর এই ইবাদাত চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন মানসিক জোর।

এই আনুগত্য করার জন্য, ইবাদাত করার জন্যও প্রয়োজন হয় ধৈর্যের, সবরের। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ

'তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। এটা আল্লাহভীরু ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন।[36]

এই কঠিন সবরের জন্যও থাকবে প্রতিদান ইন শা আল্লাহ্।

২. আসসাবরু আনিল মা'সিয়াহ : গুনাহ থেকে বিরত থাকার যে কষ্ট, এর উপর ধৈর্য। শয়তান আল্লাহর কাছে স্পর্ধা দেখিয়ে এসেছে। সে বলেছিল, 'তাদের সবাইকে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো' । আল্লাহ্ শয়তানকে অবকাশও দিয়েছেন কিয়ামাত পর্যন্ত। সে শয়তানের প্ররোচনাকে পরাজিত করা খুব সহজ নয়।

শয়তান গুনাহকে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করছে আর নফস আপনাকে অনবরত উস্কানি দিচ্ছে পা বাড়াতে। তবু আপনি টলছেন না। আল্লাহর ভয়ের ক্রন্দন, তাঁর ভালোবাসার বন্ধন আপনাকে আগলে রেখেছে পরম মমতায়। শয়তানের মোকাবেলায় আপনি জিহাদের ময়দানে অদম্য, অটল।

এ অটলতা আর দৃঢ়তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য। পাহাড়সম ধৈর্য। এর নাম সবর। গুনাহ থেকে সবর। যে সবর সম্ভব কেবলমাত্র দৃঢ় মানসিকতার আবেদের জন্যই। আল্লাহ্ বলেন :

وإنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإنَّ ذالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُوْرِ

যদি তোমরা সবর করো ও আল্লাহকে ভয় করো, তবে জেনে রেখো! তা দৃঢ় মানসিকতার কাজ।

৩. আস সাবরু আলাশ শাদাইদি ওয়াল মুসীবাহ – দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে ধৈর্য ধরা। শারীরিক কষ্ট, মানসিক যন্ত্রণার সময় তাকদীরের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ না।

[৩৬] সূরা বাকারা : ৪৫

এই তিন প্রকারের সবরের সমষ্টি পাওয়া যায় সিয়াম পালনকারীর মাঝে।

সিয়াম পূর্ণ করার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ হলো, আনুগত্যের উপর সবর।

সিয়ামের পূর্ণতার জন্য, একে কবূলিয়্যতের জন্য প্রয়োজন হয় অনেক গুনাহ থেকে বাঁচার, নফসের উস্কানি থেকে নিজেকে রক্ষার করার। এ হলো, গুনাহ থেকে সবর।

সিয়ামের সময় বিকেলের দিকে অনাহারের দরুন কষ্ট হয়,দুর্বলতা অনুভব হয়। এ হলো, দুঃখ কষ্টের উপর সবর।

রমাদান, যেন সবরের মাদরাসা। যেখানে আমাদের প্রতিনিয়ত চলে সবরের দীক্ষা, সবরের মাধ্যমে জীবনপযাপনের নমুনা।

এভাবে, নিষ্ঠার সাথে সিয়াম পালনে আমাদের সবরের গুণের উপর চলে নিত্য অনুশীলন। এ অনুশীলনকে কাজে লাগিয়ে আমরা অর্জন করতে পারি সহনশীলতা ও সর্বাবস্থায় রবের শোকর-গোজারির গুণও।

আর ধৈর্যশীল, সহনশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দা আল্লাহর কত প্রিয় আমরা জানি। জানি, জান্নাতের পথ তার জন্য কতটা মসৃণ। তবে কেন আমরা তাদের শামিল হবো না? নিশ্চয়ই হবো, ইন শা আল্লাহ্।

সপ্তম: ভীতিকর দিনে স্বস্তির পরশ

হিসাব দিবস। প্রতিদান দিবস। এত কঠিন হালত যে, সেদিন মা পলায়ন করবে সন্তান থেকে, ভাই লুকোবে ভাই থেকে, স্বামী সরে যাবে স্ত্রী থেকে।
কেন? কেননা সেদিন প্রত্যেকে ব্যস্ত থাকবে নিজেকে বাঁচানোর চিন্তায়। দুশ্চিন্তায় ও শাস্তির আশংকায় কাঁপতে থাকা অন্তর

থাকবে উদ্বিগ্ন। সবাই সেদিন একা। নেই কারো আশা। আমলনামার দৈন্যদশায় মানুষ হবে দিশাহীন। কী হবে, কী হবে–দমবন্ধ এক প্রশ্ন পুরো সত্ত্বা জুড়ে।

ঠিক সেদিন সব মানুষের মাঝে থেকেও ভয়ংকর একাকিত্বের সময়ে, একটা মানুষও পাশে না থাকার নিদারুণ অসহায়ত্বে আশার প্রদীপ নিয়ে এগিয়ে আসবে সওম!

সে সুপারিশ করবে রবের কাছে, পরম দয়ালুর কাছে। আর সেদিন সুপারিশের অনুমতি যে পাবে, তার সুপারিশই গ্রহণ করা হবে। কাউকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। ফিরানো হবে না সওমকেও। দয়াশীল আল্লাহ্ সওমের সুপারিশ গ্রহণ করে স্বস্তি দিবেন সওম পালনকারীকে। মুক্তি দিবেন সে মহাদিবসের মহাপেরেশানী থেকে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ.

সওম ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সওম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[37]

সওম কতই না উত্তম সঙ্গী! সঙ্গীহীন দিনের সঙ্গী! তবে কেন ভালোবাসার টানে সওম পালন করবো না? কে তাকে সাথী বানাবো না?

সে সওম হতে হবে বিশুদ্ধ, খাঁটি। হতে হবে পাপমুক্ত ও পবিত্র। নফসের প্ররোচনাকে ছুঁড়ে ফেলে একটি বিশুদ্ধ মাস আমরা কি পারবো সেদিনের জন্য জমা করতে?

---

[৩৭] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস ৬৬২৬; আলমুজামুল কাবীর: ১৪৬৭২;

লকলকে অগ্নিশিখা। দুনিয়ার আগুনের মত লালচে নয়, নীলচেও নয়। জ্বলতে জ্বলতে যে আগুন পরিণত হয়েছে ঘনকালো আঁধারে। আর উত্তপ্ততা? কল্পনাতীত। দুনিয়ার আগুনে দেহ পুড়েছে কখনো? সে আগুনের কাছে দুনিয়ার আগুনের তপ্ততা যেন শীতলতা, সে আগুন এতটাই ভয়াবহ, এতই উত্তপ্ত!

সে আগুন বুকে ধরে আছে জাহান্নাম। যার প্রতিটি শাস্তি অবর্ণনীয়। মুহূর্তে মুহূর্তে আপতিত হতে থাকবে নতুন নতুন শাস্তি। প্রতিটি শাস্তি হবে তার পূর্বের শাস্তির চেয়ে আরও ভয়ংকর, আরও যন্ত্রণাদায়ক।

হিসাব দিবসের দিন জাহান্নাম চাইবে সবাইকে গ্রাস করে নিতে, বিকট ফোঁসফাঁস আওয়াজে ত্রাস সৃষ্টি করবে সবার মনে। আশি হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন জাহান্নামকে আটকে রাখার কাজে। যেন সে সবাইকে গ্রাস করে ফেলতে না পারে। অতৃপ্ত জাহান্নামে যত মানুষকেই নিক্ষেপ করা হোক না কেন, সে বলতে থাকবে : হাল মিম মাযীদ? আরও আছে কি?

সকলেই আতঙ্কে অস্থির, এরপরে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত কে হবে? আমি? সকলেই ভীত, জাহান্নাম কখন কাকে যেন নাগালে পেয়ে যায়! আমাকে নয়তো?

ঠিক সে সময়। এমন ত্রস্ততা ও অসহায়ত্বের সময়। এগিয়ে আসবে সওম। জাহান্নাম আর সওম পালনকারীর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। যুদ্ধের ময়দানে মুহুর্মুহু তীর আর বর্শার বিপরীতে একজন যোদ্ধা যেমন ঢাল বাগিয়ে ধরে, সে ঢাল তার হেফাজতের উসীলা হয়; তেমনি সে ভয়াবহ সময়ে সওম পালনকারীর সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে এই সওম, হেফাজতের উসীলা হবে তার। হাদীসে রয়েছে–

الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ

সওম জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি ঢাল এবং দুর্গ।[38]

---

[৩৮] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস ৯২২৫

সপ্তম: চাওয়া আর পাওয়ার মহিমা

কে আছে এমন, যে বলে - আমার কাছে চাও, আমি দিবো?
কে আছে এমন, যে কষ্ট পায় না চাইলে?
কেউ নেই!
কে চায়, নিজের ভাণ্ডার কমাতে?
কে চায়, নিজের কিছু অন্যকে দিয়ে দিতে?
যদিও বা কেউ চায় অকাতরে বিলাতে – তার নিজের ভাণ্ডারইবা কতখানি?
কতজনের কত চাওয়া সে পূরণ করতে পারবে?

সম্পদের ক্ষেত্রেই মানুষের সীমা এত এত ক্ষুদ্র যে, একজন মানুষের সবগুলো চাওয়াই পূর্ণ করা কারো সম্ভব নয়, তবে সম্পদের বাইরে গিয়ে অন্য চাওয়ার ব্যাপারে কী ধারণা? মানুষ কি পারবে কারো সন্তানের চাওয়া পূরণ করতে? কেউ কি পারবে কারো সম্মান বা লাঞ্ছনার দায়িত্ব নিতে? কেউ কি পারবে কারো জীবনের সব দায়ভার গ্রহণ করতে?
না! কেউ নেই!
কত বিস্ময়কর!
মানুষের ক্ষমতার সীমা কত স্বল্প!
অথচ এই অতিক্ষুদ্র পরিধিতেই তার কত দাপট!
আমাদের এই দাপট, আমাদের এই অহংকার আমাদের অন্ধ বানিয়ে রাখে।
.
এই অন্ধত্ব আমাদের দেখতে দেয় না –
- সে ধনভাণ্ডারকে, যা অকাতরে বিলালেও কখনো উজাড় হবে না। বরঞ্চ সামান্যও কমবে না।
- সে রাজত্বকে, যে রাজত্বে ‘নেই’ বলে কোন শব্দ নেই।
- সে মহামহিমকে, যাঁর দাসত্বের মহিমার কাছে ফিকে সবকিছুই
- সে মহাসত্ত্বাকে, যিনি সর্বদাতা। সম্পদ থেকে সন্তান, বিপদমুক্তি থেকে সম্মান – সব, সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

একমাত্র একক সত্ত্বা – যিনি চাইলে খুশি হন, না চাইলে হন অসন্তুষ্ট।
সব চাওয়া পূরণ করার ক্ষমতাও তাঁর আছে।
শুধু প্রয়োজন– আত্মসমর্পণ। পরিপূর্ণরূপে ত্মসমর্পণ। 'আমিত্ব' বলতে কিছু না থাকা। এরপর চাও, যা কিছু আছে চাওয়ার। তিনি দিবেন।

এই চাওয়ার নাম দোয়া। দোয়া অর্থ আহ্বান। কাকে? মহাশক্তিধর সে সত্ত্বাকে।
কিভাবে? কতটা আকুল হয়ে?
দুধের শিশুর যখন ক্ষুধা লাগে, তখন সে মায়ের দিকে কিভাবে তাকায় দেখেছেন কখনো?
বুঝতে চেষ্টা করেছেন তার আকুলতা?
সন্তান যখন অসুস্থ থাকে, তখন মায়ের মন কতটা হয় ব্যাকুল?
তারচে’, তারচে’ও বেশী আকুলতা নিয়ে, ব্যগ্র ব্যাকুলতা নিয়ে ডাকতে হবে তাঁকে।
মনের সব কিছু উজাড় করে, হৃদয়টাকে শূন্য করে একটা ডাক দিন তো – আল্লাহ্!
দয়াময় কি শুনবেন না? বান্দার এই অস্তিত্বজুড়ে আসা আহ্বান? অবশ্যই ইন শা আল্লাহ্।

এরপর তাঁকে বলতে হবে। কী বলতে হবে?
যা আছে মনজুড়ে। চাওয়া, অভিমান, অনুযোগ, দুঃখ, কষ্ট – সব!
একজন আপনার মানুষকে যেভাবে বলেন, ঘনিষ্ঠ মানুষের কাছে যেভাবে নিজেকে তুলে ধরেন; তারচে’ও অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে। আরও অনেক বেশী আর্দ্র অন্তরে। বলতে থাকুন, বলতেই থাকুন; যতক্ষণ না...... মন ভিজে আসে।
চোখ অশ্রু ঝরায়।
অন্তরটা শূন্য হয়।
চিত্ত প্রশান্ত হয়।

অপার্থিব স্নিগ্ধতায় চারপাশ ছেয়ে যায়।
হৃদয় চিড়ে একটা শব্দ বের হয় – আল্লাহ্!

দোয়ার জন্য আরও একটি শব্দ ব্যবহার হয়, মুনাজাত। মুনাজাত অর্থ হলো, কানে কানে কথা বলা। কানে কানে মানুষ একান্ত গোপন কথাগুলোই বলে। শুধু সে কথাগুলোই যা কেবল তাকেই বলা যায়। আল্লাহর সাথেও আমাদের মুনাজাতের মুহূর্তটা তেমনই। কিছু কথা বলার মুহূর্ত, যা কেবলমাত্র তাঁকেই বলা যায়; এমন কিছু কথা বলার সময়, যা বোঝার মত চেপে আছে মনে। তাঁকে বলে হালকা হওয়া যায়। শুধুমাত্র তিনিই যে সব বোঝা সহসাই সরিয়ে দিতে পারেন।
কানে কানে মানুষ যেমন আস্তে কথা বলে আর অপরজন তা শুনে নেয়, তেমনি আল্লাহর সাথে মুনাজাতে যত আস্তেই কথা বলুন, তিনি অবশ্যই তা শুনে নেবেন। যে আল্লাহ্ না বলা কথাগুলোই বুঝে যান, না বলা প্রয়োজনগুলোও পূরণ করে দেন, সে আল্লাহ্ কি বলতে পারা কথাগুলোকে অযথাই ফিরিয়ে দেবেন?
না, তিনি অবশ্যই পরম মমতায় গ্রহণ করে নিবেন ইন শা আল্লাহ্। আমরা তো তাঁর কাছে এই-ই প্রত্যাশা রাখি।

এই প্রত্যাশা আর চাওয়া-পাওয়ার উদারতা অনেক বেশী বেড়ে যায় রমাদানে।
সারাদিন আপনি অভুক্ত, কার জন্য? শুধুই তাঁর জন্য।
গুনাহ থেকে বিরত, কার জন্য? শুধুই তাঁর জন্য।
শেষ রাতে সাহর করেছেন, কার জন্য? শুধুই তাঁর জন্য।
দিনভর সবরের পরীক্ষা দিয়েছেন, কার জন্য? শুধুই তাঁর জন্য।
আপনি ইখলাসের সাথে তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন আর তিনি আপনার আহ্বানে সাড়া দিবেন না? অবশ্যই দিবেন। দেখুন না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন,

---

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدّ دَعْوَتُهُمُ: الصّائِمُ حَتّى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم.

তিন ব্যক্তির দুআ ফেরত দেওয়া হয় না–সায়েম ব্যক্তির দুআ, যতক্ষণ না সে ইফতার করে; ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ ও মযলুমের দুআ।[39]

হে সায়েম!

আল্লাহ্ চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। না ফেরানোর ওয়াদা দিয়েছেন। শুধু একটা শর্ত–বিশুদ্ধ ইবাদাত। আমরা কি কেবল এইটুকু পারবো না?

তিনি তো দিতে প্রস্তুত সব সময়ই, আমরা চাইতেও পারবো না? চাওয়ার যোগ্যতাটুকু আমাদের মাঝে আনতে পারবো না?

ইন শা আল্লাহ্। মুমিন কখনো নিরাশ হয় না, আমৃত্যু চলতে থাকে চেষ্টা। মৃত্যুর পর দেখতে পায় চেষ্টার সফলতা।

রমাদান: সওয়াবের খাযানা

আমার রব অশেষ দয়ালু। বড়ত্বের শীর্ষে যিনি, করুণার শিখড়েও তিনি। তিনি স্বয়ং বলেছেন,

إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي

'নিশ্চয় আমার রহমত আমার রাগকে ছাড়িয়ে গেছে।[৪০]

তাঁর দয়ার একটি ছোট্ট নিদর্শন দেখুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

[৩৯] সহীহু ইবনি হিব্বান, হাদীস ৩৪২৮

[৪০] সহীহুল বুখারী: ৭৫৫৩

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَة ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَملَها كَتَبها الله عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنات إلى سبعمائةِ ضعفٍ إلى أضعاف كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيئَةٍ فَلَمْ يعْمَلْهَا كَتَبها الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كاملَةً ، وَإن هَمَّ بِها فَعَمِلَها كَتَبها الله سيئَةً وَاحِدَةً

যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু আমল করতে পারল না, আল্লাহ এ নিয়তের বিনিময়ে নিজের কাছে পূর্ণ একটি নেকী লিখে রাখেন। আর ব্যক্তি যদি নিয়ত করে এবং আমলও করে, তাহলে আল্লাহ আমলের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ এবং আরো বেশী সওয়াব লিখে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো পাপ কাজের ইচ্ছা করে, তবে কাজটি আর না করে, তাহলে আল্লাহ পাপ বর্জনের বিনিময়ে নিজের কাছে একটি পূর্ণ পুণ্যের সওয়াব লিখে নেন। আর যদি কেউ পাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং ইচ্ছা বাস্তবায়নও করে, তাহলে আল্লাহ শুধু একটি পাপের গুনাহ লিখে রাখেন।[৪১]

দেখুন না! কৃত পুণ্য লিখা হয় দশ থেকে সাতশ' গুণ বাড়িয়ে, অথচ পাপ লিখা হয় কেবলমাত্র একটিই। অন্যান্য হাদীসে এমনও রয়েছে যে, পাপ করার সাথে সাথেই তা লিখে ফেলা হয় না, বরং একটা সময় পর্যন্ত দেরী করা হয় বান্দার তাওবার অপেক্ষায়। তাওবাহ করলে তা আর লিখাই হয় না!

আরও দেখুন! পুণ্য কিন্তু সাথে সাথেই লিখে ফেলা হয়, উপরন্তু সে পুণ্যের উসীলায় আগে কএ ফেলা কো সাগীরাহ গুনাহও মাফ হয়ে যায়!

কত মহান মালিক আমাদের!

কত করুণাময় অভিভাবক আমাদের!

তাঁর করুণা রমাদানে যেন আরও তীব্র বেগে বর্ষে। মুষলধারায় বৃষ্টির ন্যায় এ মাসে পুণ্যের ফোয়ারা ছোটে বছরের অন্যান্য সময় থেকে আরও বহুগুণে বর্ধিত হয়ে, আরও তীব্রতা ও আনন্দের বারিকণা নিয়ে।

বছরের অন্য সময় যে পুণ্য বেড়ে যায় দশগুণে, রমাদানে সে পুণ্য বেড়ে যায় সত্তরগুণে।

[৪১] সহীহুল বুখারী : ৬৪৯১।

একবার সুবহানাল্লাহ পড়ছেন, বছরের অন্য সময় আমলনামায় উঠবে সর্বনিম্ন দশটি পুণ্য। এই দশ বাড়তে পারে সাতশ' গুণ পর্যন্ত। কিন্তু রমাদানে? তা হবে সর্বনিম্ন সত্তর। এ সত্তর বাড়তে পারে আরও সাতশ' গুণে।

দুইটাকা সাদাকাহ করছেন? বছরের অন্য সময় আমলনামায় উঠবে সর্বনিম্ন বিশটি পুণ্য। এই বিশ বাড়তে পারে সাতশ' গুণ পর্যন্ত। কিন্তু রমাদানে? তা হবে সর্বনিম্ন একশ' চল্লিশ। এ একশ' চল্লিশ বাড়তে পারে আরও সাতশ' গুণে। এজন্যেই বুঝি রমাদানে দানশীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানও বেড়ে যেত, যেন দানের চেয়ে দানের প্রতিদান জমা হতে থাকে অনেক অনেক গুণ বেশী। হাদীসে আছে,

---

كَانَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। রমাদান মাসে তাঁর দানের হস্ত আরো প্রসারিত হত।[৪২]

যাঁর মুক্তির ঘোষণা হয়ে গেছে পূর্বেই, যিনি সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উপবিষ্ট আগ থেকেই, সেই তিনিই যদি রমাদানে হয়ে উঠেন আরও ব্যাকুল, রাদানের ফযীলত পাওয়ার জন্য আকুল, তবে আমরা কেন হবো না? অন্তত তাঁকে অনুসরণ করার জন্য হলেও কি আমাদের আগ্রহী হওয়া উচিত না?

আরও শুনুন! রমাদানে নফল সালাতের সওয়াব বছরের অন্য সময়ে ফরজ আদায়ের সমান। আর ফরয? এক ফরয সত্তর ফরযের পুণ্য হাসিল করবে। এ হাদীসেরই কথা। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন –

مَنْ تَقَرّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ.

---

[৪২] সহীহুল বুখারী: ১৯০২

রমাদান মাসে যে ব্যক্তি একটি নফল আদায় করল, সে যেন অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল। আর যে এ মাসে একটি ফরয আদায় করল সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করল।[43]

এ মাসে ওমরা আদায়ে মিলবে হজ্জের মওসুমের হজ্জের সমান সওয়াব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

রমাদানের ওমরা হজ্ব সমতুল্য।[44]

এ তো হল সওম ছাড়া এ মাসের অন্যান্য আমলের সওয়াব। আর সওমর সওয়াব? সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নিজেই হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন-

إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

নিশ্চয় সওম আমার জন্য, আর এর প্রতিদান আমিই দিব।[45]

সব ইবাদাতই তো আল্লাহর জন্য। তবু সওমের কত মাহাত্ম্য যে, আল্লাহ্ বলছেন, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব!

ধরুন, আমাদের কাছে অনেক কিছু থাকে–খাতা, কলম, বই, ডায়রি, ব্যাগ, ঘড়ি। কিন্তু এরপরও কোন কোন জিনিসের ব্যাপারে আমাদের বলতে ভালো লাগে, 'ডায়রিটা আমার'। কেন? কারণ, এটা আমাদের জন্য স্পেশাল। বিশেষ কিছু। অনেক বেশী গুরুত্বের। সওমের ব্যাপারেও আল্লাহ্ এমনই বলেছেন, 'এ সওম আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দিবো!'

আমাদের কাছে যা বিশেষ কিছু, তার প্রতি আমরা কতটা যত্নশীল হই, তাহলে চিন্তা করুন তো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর

---

৪৩ বাইহাকী, শুআবুল ঈমান: ৩/৩০৫-৩০৬

৪৪ জামিউত তিরমিযী: ৯৩৯; সুনানু আবি দাউদ: ১৯৮৬

৪৫ সহীহুল মুসলিম: ১১৫১

কাছে যা বিশেষ কিছু, তিনি সে বিষয়টির কত যত্নশীল হবেন! কত উত্তম আর আনন্দময় প্রতিদান দিবেন! কিন্তু তিনি সে প্রতিদানের কথা বলেন নি। হয়তো......... হয়তো......... সওম পালনকারীদের চমকিত করার জন্য! অতি বিস্ময়কর আনন্দময় মুহূর্ত উপহার দেয়ার জন্য!

হে সায়েম! হে রোযাদার!
রব তোমার জন্য প্রতিদান লুকিয়ে রেখেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন, তা হবে বিশেষ কিছু।
এসো না তবে, যত্নশীল হই নাওয়াফেলের প্রতি; তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন, তারাবীহের প্রতি। সওয়াবের খাযান জমাতে জমাতে সে মধুর অপেক্ষায় কেটে যাক না আমাদের জীবনের একটি, দু'টি, অনেকগুলো রমাদান! (যদি বেঁচে থাকি)।

সওম: দুই আনন্দের এক বারিধারা

ইফতারের মুহূর্তটা কেমন? দিনশেষে অভুক্ত, পিপাসার্ত ব্যক্তির সামনে খাবার থাকলে কেমন হওয়ার কথা?
ইফতারের আগ মুহূর্তে সামনে যে খাবারই আসে, মনে হয় আমি একাই সব খেয়ে নিবো। জগের পানি সবটা একাই পান করে ফেলব। সে সময় সবই যেন অতি সুস্বাদু, অতি মিষ্ট। হোক না তা সামান্য দু'টো খেজুর অথবা যবের ছাতু। তবুও কিছু খাওয়া যাবে না, কিছু ছোঁয়া যাবে না, যতক্ষণ না ইফতারের সময়ত হয়। এরপর যখন কানে ভেসে আসে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার............। সাথে সাথেই একটি খেজুর আর পরমুহূর্তের কিছু পানি পান করার পর মনের প্রশান্তিটুকু কি ভাষায় ব্যক্ত করার মতো? এজন্যেই হাদীসে এসেছে,

---

لِلصّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.

সায়েম ব্যক্তির আনন্দ উপভোগের দুটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারের সময়, অপরটি স্বীয় প্রভূর সাথে সাক্ষাতের সময়।[46]

হাদীসের দ্বিতীয়টি অংশটি দেখুন! স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়।

আহ!

সে সময়, যখন সবাই হবে পেরশান।

সে সময়, যখন সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

সে সময়, যখন সবাই শাস্তির ভয়ে আচ্ছন্ন।

ঠিক সে সময়......... আপনি আনন্দিত।

এ আনন্দ মুক্তির।

এ আনন্দ অযাচিত কোন নিয়ামত প্রাপ্তির।

এ আনন্দ দুনিয়াতে অভুক্ত থাকার প্রতিদানের।

এ আনন্দ রবের ভালোবাসায় মহিয়ান।

দুনিয়ায় নগদ এক আনন্দ আর বাকী থাকা মহাসাফল্যের দিনের আনন্দ!

আমরা কেন করবো না সিয়াম সাধনা? কেন হবো না মহাসাফল্যের আনন্দে উজ্জীবিত?

সপ্তম: রাইয়্যানের শাহী তোরণ যাঁর অপেক্ষায়

জান্নাত। বাগান। নাম জানা আর না জানা সহস্র ফুলের বাস। রঙে, ঘ্রাণে পুরো জায়গাটা যেন কয়েক মুহূর্ত আনমনা করে রাখে। অজস্র পাখির কলতান, মিষ্টি সুরের শিস কিংবা অজানা সুরের টান। পৃথিবীটা যেন মুহূর্তকাল থমকে যায়। মিষ্টি বিকেল, মৃদু বাতাস, প্রাণবন্ত চারপাশ, এক চিমটি খোলা আকাশ আর আছে উপভোগ করার মত প্রশান্ত চিত্ত। অন্তর যেন ভিজে আসে, ইচ্ছে

৪৬ সহীহুল মুসলিম: ১১৫১, সহীহুল বুখারী: ১৯০৪

হয় সময়টা আটকে দেই। দুনিয়ার এমন একটি ক্ষণ উপহার পেলে, যে কেউ হয়তো বলে বসবে–‘এরচে’ বেশী সুখ কি আর হতে পারে?!’

এ তো দুনিয়ার ‘জান্নাত’। আখেরাতের ‘জান্নাত’? উঁহু! সে বর্ণনা দেয়ার মতো আমার কাছে না আছে শব্দ, আর না আছে কল্পনা। অনুভূতির নৈঃশব্দতাতেও হৃদয় আকুল সে কাঙ্ক্ষিত অনুভূতি ছুঁতে, কিন্তু তা অপার্থিব, দুনিয়াতে অধরা। জান্নাত এতটাই মনোহর, এতটাই সুখময়। উঁহু, এতটা নয়, এর চে’ বেশী আনন্দময়। কত বেশী? রাসূল বলছেন, ‘ততটা যা ভাবেনি কোনো হৃদয়, শোনেনি কোনো কান’।

সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতীর নেয়ামাতই হবে এত অসাধারণ, অকল্পনীয়। তবে জান্নাতুল ফিরদাউস, রাইয়্যানের অসাধারণত্ব কতটা হবে?

জান্নাতগুলোর মধ্যে একটির নাম জান্নাতুর রাইয়্যান, পরতৃপ্তের জান্নাত।

দুনিয়াতে অন্তর পরিতৃপ্ত হওয়া কত বড় নেয়ামত? জান্নাতের প্রশান্তি তবে কতটা হতে পারে? সেখানে শুধু অন্তরের প্রশান্তিই থাকবে না, থাকবে অন্তরের সব চাহিদার সমন্বয়।

এ এক বিশেষ স্তর। বিশেষ মানুষদের জন্য।

এ এক ভালোবাসার রাজ্য। ভালোবাসার মানুষদের জন্য।

আপনি কি হতে চান, সে রাইয়্যানের অধিবাসী?

সে বিশেষ আর ভালোবাসার মানুষ?

তবে সিয়াম পালন করুন। বিশুদ্ধ সিয়াম। কেবলই আল্লাহর জন্য। সকল প্রকার কলুষতামুক্ত। তবেই রাইয়্যানে আপনার স্থান হবে পোক্ত। রবে রাইয়্যানের শাহী তোরণ আপনার অপেক্ষায় উন্মুখ। সায়েম ছাড়া সে তোরণ ছাড়িয়ে ভিতরের মনোহরী রাজ্যে যেতে পারবে না আর কেউ। আপনি হাসতে হাসতে তাতে প্রবেশ করবেন আর ফেরেশতারা আপনাকে জানাবে অভিবাদন–‘সালামুন আলাইকুম, সালামুন আলাইকুম......’।

এ আমি বলছি না। এ সুসংবাদ দিয়ে গেছেন হাবীবে রব্ব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। তিনি বলেছেন,

إِنّ فِي الجَنّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرّيّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ.

জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি তোরণ আছে, যা দিয়ে সায়েমরা প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া অন্য কেউ সে তোরণ দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।[47]

দরজার নামই যখন রাইয়ান, পরিতৃপ্ত। তবে যে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে কি পিপাসার্ত হবে কখনো?

হে সায়েম!
তবে আর দেরী কেন? আসুন না! নিয়তকে করি ইখলাসে সুসজ্জিত আর জান্নাতের পথে এগিয়ে যাই দ্রুত!

রমাদান: শয়তানের বন্দিত্বে ডানা মেলুক মুক্তপাখি

মানব সৃষ্টির শুরু সময়ের কথা। আদম আ. তখন একমাত্র মানুষ। ইলমের প্রতিযোগিতার পর রব তাঁদের আদেশ দিলেন আদম আ.কে সাজদা করতে। সেখানে থাকা সবাই, একেবারে সবাই সাজদা করলেন, কিন্তু করলো না একজন। আদতে তো সে ফেরেশতাকুলের কেউ ছিলোই না! নয়তো আল্লাহর আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা তার হয় কী করে? তাও আবার তাঁরই সামনে উপস্থিত থেকে! আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হলেন। জানতে চাইলেন, 'আমি বলার পরও আদমকে সাজদা করতে তোমায় বাধা দিলো কে?' প্রচণ্ড অহংকারভরে সে উত্তর দিলো, 'কারণ আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ। সে মাটির তৈরি আর আমি আগুনের তৈরি'।
এক তো আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন, আবার অহংকারী উত্তর! আল্লাহ্ রাগান্বিত হলেন। আসমানের অধিপতি যার উপর রাগান্বিত হন,

[৪৭] সহীহুল বুখারী:২৫৪; সহীহ মুসলিম: হাদীস ১১৫২

কে আছে তাঁকে বাঁচানোর! কেউ নেই! কেউ নেই! তিনি তাঁকে তাঁর কাছ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, বললেন, সে ‘অভিশপ্ত’, ‘বিতাড়িত’, ‘শয়তান’।
ধৃষ্ঠ আর উদ্ধত অভিশপ্ত শয়তান তখন এক সংকল্প করলো। আদমকে সাজদা না করায় তাঁর এই শাস্তি, কাজেই সে পিছু ছাড়বে না আদমের আর আদম সন্তানের। সে আল্লাহর সামনে দেখিয়ে এলো আরও এক ঔদ্ধত্য, ‘আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করেই ছাড়বো’।
আল্লাহ্ বললেন, ‘আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের পারবে না।‘
ক্ষিপ্ত শয়তান সেই থেকে আমাদের শত্রু, প্রকাশ্য শত্রু। অথচ আমরা কী বোকা! সে শয়তানের কুমন্ত্রণাতে সাড়া দেয়াই যেন আমাদের আনন্দ, আমাদের সফলতা। শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে গুনাহকে সুন্দর সাজিয়ে উপস্থাপন করে আর আমাদের নফস তাতে সাড়া দেয়।

মুমিন মাত্রই চায় শয়তানের কুমন্ত্রণাকে হারিয়ে দিতে, ঈমানের বিলে বলীয়ান হয়ে শয়তানী ফাঁদ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু, সব সময়ে পেরে উঠে না। পরাজিত হয়ে লিপ্ত হয় গুনাহয়। আল্লাহ্ হন অসন্তুষ্ট। যদি সে গুনাহের পর তাওবা নসীব হয়, তবে তো আল্লাহর সন্তুষ্টি মিলে যায়। বরঞ্চ গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর অনুতাপের অশ্রুফোঁটা আল্লাহর কাছে বেশী-ই পছন্দ। কিন্তু যদি তাওবা নসীব না হয়? বান্দা নিজের ভুল বুঝতেই না পারে? এর চেয়ে দুর্ভাগা কে আছে? এর চেয়ে দুর্ভাগা কে আছে!
আবার কখনো শয়তান বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের ও আমাদের সৎকাজের মাঝখানে। কখনো সাদকাহ করার সময় মনে কুমন্ত্রণা জাগে, ‘এই টাকাটা দিয়ে অমুক জিনিসটা কিনতে পারবো। সালাতে দাঁড়ানোর সময়ে মনে মন্ত্রণা আসে, ‘থাক! ‘সালাতের সময় তো আছে, শেষ ওয়াক্তে পড়লেও তো সালাতই!’ এভাবে ইচ্ছা ও সৎকাজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কত আমল আমরা করি না। শয়তানের বেড়াজালে বন্দী হয়ে দুর্বল করে দেই নিজেদের ঈমান।

রমাদান মুমিনের এক বিরাট সুযোগ। শয়তানের ওয়াসওয়াসামুক্ত হয়ে রবের ইবাদাতে নিজেকে নিমগ্ন করার। তখন থাকে না কুমন্ত্রণা কিংবা শয়তানী বাধা। কেন?
কারণ, শয়তান থাকে সে সময় বন্দী।
একদিকে রমাদানের আগমন আর একদিকে শয়তানের নির্বাসন। রমাদান আসার সাথে সাথেই শয়তানকে শিকলে বেঁধে ফেলা হয়। সে আফসোস করতে থাকে, আর আদম সন্তানের সাফল্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে।
আরও একটি সুসংবাদ আছে সায়েমের জন্য–
রমাদানে জাহান্নামের দরজাগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু খোলা থাকে জান্নাতের দরজা। রহমতের ফল্গুধারা যেন ছেয়ে নেয় পৃথিবীর চারপাশ। এক অপার্থিব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয় হৃদয়। বেড়ে যায় ইবাদাতের স্বাদ আর কমে যায় গুনাহের মোহ। এই তো মোক্ষম সময় আত্মশুদ্ধির, আত্মগঠনের। আল্লাহর নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে গেছেন আমাদের সে সুখবর,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

যখন রমাদান শুরু হয়, জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।[48]

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, রমাদান মাস শুরু হলেই রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।[৪৯]

হে সায়েম!
তবে এ মাসই হোক আমাদের আত্মগঠনের সুবর্ণ সময়।
রমাদানের বরকতে আসুক এমন পরিবর্তন, যে পরিবর্তন ফেরায় রবের পথে।

[৪৮] সহীহুল বুখারী: ৩২৭৭; সহীহুল মুসলিম: ১০৭৯
[৪৯] সহীহুল মুসলিম: ১০৭৯

শয়তানের মন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে ঠিক করি জীবনের পথ, যে পথের শেষ প্রভুর সন্তুষ্টিতে।
রহমতের বাতাসে শুদ্ধ হয়ে গড়ি এমন জীবন, যে জীবন হয় শুরু সুখময় আনন্তকালের।
এখানে সন্দিহান মনে প্রশ্ন জাগে, যদি শয়তান রমাদানে বন্দীই থাকে, তাহলে তো সে মাসে মানুষের গুনাহ করার কথাই না। অথচ তবুও তো সে মাসে মানুষ গুনাহ করে! কেন করে?

পাঠক! কেউ যখন একবার বাঘের থাবায় আক্রান্ত হয়, তার সে জখম কি নিমিষেই সেরে যায়? না, সে যন্ত্রণা অনেকদিন ভোগায়, সঠিক পদ্ধতির চিকিৎসা হতে পারে তার সুস্থতার উসীলা।
শয়তানের থাবা তো এর চেয়ে ভয়ংকর! তার প্রভাব কি থেকেই যায় না? নফস যে শয়তানের এতদিন গোলামী করেছে, তা কি মুহূর্তেই সে ভুলে যায়? না, সে প্রভাব থেকেই যায়। কিন্তু কেউ যদি খাঁটি অন্তকরণে শুদ্ধ হতে চায়, মুক্তির পথে লড়ে যায় সেই পায় মুক্তি। রমাদান নফসের জন্য সঠিক পদ্ধতির চিকিৎসা।

এ কথাই বলছেন কাজী ইয়ায রহ. বুখারী শরীফের শরাহ 'ফাতহুল বারীতে', 'শয়তান শিকলে আবদ্ধ থাকার অর্থ আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থেই হতে পারে। রূপক অর্থে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রমজানে শয়তানের ধোঁকা-প্রবঞ্চনার হার কমে যায়, অন্যায় কাজ কম হয় এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর বিধান পালনের প্রতি আগ্রহ প্রবল থাকে। এ অর্থে উল্লিখিত হাদিসে বাস্তব জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যার বাস্তবতা আমরা সবাই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে থাকি।[50]
আর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা হলে হাদিসের অর্থ হলো, মানুষ পাপ করে দুই কারণে—১. তার কুপ্রবৃত্তি ও বদ-অভ্যাসের কারণে; ২. শয়তানের প্ররোচনায়। রমজানে শয়তান বন্দি থাকলেও কুপ্রবৃত্তির কারণে মানুষ পাপ করে থাকে।[51]
ব্যাখ্যার প্রথমাংশে তিনি বাতলে দিচ্ছেন হাদীসের আরও একটি সম্ভাবনা। মানুষ যখন রবের দিকে ফিরতে চায়; তখন শয়তানের

---

[৫০] ইকমালুল মুলিম : ৪/৬

[৫১] ফাতহুল বারি : ৪/১১৪

অস্ত্র হয়ে পড়ে দুর্বল। মানুষ যখন নফসকে আল্লাহর প্রতি অনুগত করতে চায়, শয়তানের ওয়াসওয়াসা তখন ফিরে যায় ব্যর্থ হয়ে। এ যেন শয়তানের বন্দীত্বই।

রমাদানে মানুষের অবস্থা তো এমনই হয়। রমাদানের স্পর্শে মানুষ নিজের আমলনামা নিয়ে নতুন করে ভাবে, নতুন করে নিজেকে গুছিয়ে নিতে চায়, এতে করে দুর্বল হয়ে পড়ে শয়তান। এছাড়া তাহাজ্জুদ তো সারা বছরের নফসের জন্য এক কঠিন চিকিৎসা, কুরআনের ভাষায়,

---

إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡـٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا

'নিশ্চয়ই রাতের শেষাংশ নফসকে দলিত মথিত করার জন্য কঠিন সময় এবং দৃঢ় কথার মুহূর্ত'।[52]

তাহলে রমাদানের আরও বেশী দৃঢ়তা ও মন্দপ্রবণ নফসের দুর্বলতায় তাহাজ্জুদে নিয়মিত মানুষগুলোর কাছে শয়তান ভিড়বে কী করে? এ কি শয়তানের বন্দীশালা নয়?

রমাদান : পরিবর্তনের সওগাত

আল্লাহ বলেন,

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ

রমাদান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতরূপে এবং হিদায়াত ও ফুরকানের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে। সুতরাং যে এ মাসে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সওম করে।[53]

এখানে আল্লাহ বলেননি–সে যেন এ মাসের দিনগুলোতে সওম করে, বরং বলেছেন, সে যেন এ মাসে সওম করে। অর্থাৎ

---

৫২ সূরা মুযযাম্মিল: ০৬

৫৩ সূরা বাকারা : ১৮৫

রমাদানের প্রত্যেকটা সওম আলাদা আলাদা নয় যে, আজ সওম করলাম, কাল ভঙ্গ করলাম। বরং সবগুলো সওম মিলেই যেন একটি একক।

রমাদানের কোনো একদিন সওম ভঙ্গ করার দ্বারাই যেন এ একক ভেঙ্গে যায়। তাই তো রমাদানে যে ব্যক্তি একটি সওম ভঙ্গ করবে অন্য মাসে তাকে ষাটটি সওম করতে হবে, সেটিও ধারাবাহিকভাবেই। একটি সওমের বিনিময়ে ষাটটি সওম! একই রমাদানেরত দু'টি সওম ভঙ্গ করলেও কাফফারা ষাটটি সওমই। আবার ষাট দিনের কাফফারা আদায় করতে গিয়ে কোন একটি ছুটে গেলে আবার ষাটটি সওম তাকে নতুন করে শুরু করতে হয়। মোদ্দাকথা, এ যেন একক, যে এককের চাহিদা হলো ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

এ ধারাবাহিকতা শুধু সওম পালনের নয়, এ ধারাবাহিকতা সওম কবূল হওয়ার অন্যান্য শর্তাদি পালনের জন্যও। যখন এ মাসের পুরো সময়টাই কাটবে সওমের অভ্যাসে, তখন সে কুরআনের নির্দেশিত পথ খুঁজে পাবে। সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলা সহজ হয়ে যাবে।

রমাদানের সমগ্র দিনগুলো মিলে একটি একক ধরার হয়তো এটাও একটি হিকমাহ যে, কোনো একটি গুণ অর্জন বা কোনো একটি স্বভাব পরিবর্তনের জন্য ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। দু' একদিন কোনো কাজ করার দ্বারা তাকে অভ্যাস বলা যায় না। মুত্তাকির মাঝে তাকওয়ার গুণগুলো নিত্যদিনের অভ্যাসের মতো হয়ে থাকবে, গুণাহ না করার অভ্যাস তার রুটিনে পরিণত হবে। সেটা তখনই সম্ভব যখন নিছক আবেগ নয়, বরং অনুশীলনের ধারাবাহিকতা থাকবে। কোন বিষয়কে অভ্যাসে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন পূর্ণ একটি মাসের পূর্ণাঙ্গ সময়।

কেউ যদি একটি দিন রোযা ভঙ্গ করে অথবা একটি দিন তাকওয়া পরিপন্থী কোনো কাজ করে ফেলে, তাহলে একক ভেঙ্গে যাচ্ছে। সুতরাং তাকওয়ার মাসের অনুশীলন আমাদের শুরু হওয়া উচিৎ একদম প্রথম দিন থেকে। এ প্রাক্টিস অব্যাহত রাখতে হবে রমাদানের শেষ দিন পর্যন্ত। যদি ধারাবাহিকতা ও অবিচলতা ধরে

রাখা সম্ভব হয়, তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ আমাদেরকে সারা বছর অবিচলতা ধারণ করার তাওফীক দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

তুমি অবিচল থাকো, যেভাবে তোমাকে আদেশ করা হয়েছে।[54]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল হলো ওই আমল যা অল্প হলেও ধারাবাহিক।[55]

যদি আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তরিক হই, তবে আমাদের উচিৎ সমগ্র রমাদানকে সমানভাবে গুরত্ব দেওয়া, কোনোভাবেই যেন আমার দ্বারা গুনাহ না হয়ে যায়। যদি গুনাহ হয়েও যায়, সাথেই সাথেই যেন তাওবা করে ফিরে আসি। প্রচলিত কথা আছে-

Slow and Steedy wins the game.

রমাদানে শয়তান বন্দি, নফস দুর্বল। এখনো যদি গুনাহ হয়, তবে কতটা নিষ্প্রাণ আমদের হৃদয়। কতটা দুর্বল আমাদের ঈমান। ঈমান শক্তিশালী হয় কুরআন তিলাওয়াতে। কুরানের মাসেই যদি ঈমান শক্তিশালি করতে না পারি, তবে আর কবে?

আমাদের আল্লাহ্ বলছেন, ফিরে এসো রবের পথে।[56]

তিনি করে দিয়েছেন অনেক উসীলাও। বাতলে দিচ্ছেন অনেক পথ। এরপর সেই পথকে করেছেন সহজ, সুবিস্তৃত। এরপরও আমরা বদলাবো না? ফিরব না?
গুনাহের কালিগোলা আঁধার থেকে রবের দেখানো আলোর পথের দিকে ছুটবো না?
কেন না?

---

৫৪ সূরা হুদ : ১১২

৫৫ সহীহুল বুখারি : ৫৮৬১

৫৬ সূরা তাহরীম : ৮

অবশ্যই! লাব্বাইক বলে আসুন শামিল হয়ে যাই সত্যের পতাকাতলে।
নিজের মাঝে আনি পরিবর্তন এই রমাদানে।
আর আজীবনের অনুশীলনে উত্তীর্ণ হই রবের পরীক্ষাতে।

সওম: ইখলাসের সুঘ্রাণে ভেসে যাক তনু-মনের দুর্গন্ধ

সুবহে সাদিক থেকে গুরূবে শামস (সূর্যাস্ত) পর্যন্ত আপনি পানাহার থেকে বিরত। গলা দিয়ে পানি বা কোন কিছু পেটে চলে যায় কি না, এ ভয়ে আপনি মিসওয়াকও করেছেন খুব সাবধানে। এই অনাহারের ফলে মুখে তৈরি হয় অস্বস্তিকর এক গন্ধ।

সায়েম!
আল্লাহ্ আপনাকে কতটা পছন্দ করেন, এর একটা নমুনা এখানেও আছে। এই যে মুখের দুর্গন্ধ, আপনি সারাদিন ভুগছেন অস্বস্তিতে, শুধুমাত্র এইজন্যও আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করেন। আপনার মুখের গন্ধ তাঁর কাছে প্রিয়। মিশকের কী ঘ্রাণ, তার চেয়েও বেশী প্রিয়। কারণ, এ গন্ধের সাথে মিশে আছে ভালোবাসা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَخلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ

নিশ্চয় সওমদারে মুখের (পানাহার বর্জনজনিত) গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষা উত্তম।[57]

এ গন্ধ নোংরামির অভ্যাসের কারণে যেন না হয়। মিসওয়াক না করার জন্য যেন না হয়। কারণ, পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানেরই একটি শাখা। পরিচ্ছন্ন না হলে ঈমানের একটি শাখা অনাদেয় থাকবে। সওয়াবের উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা পরিচ্ছন্নতা নিশ্চয়ই রমাদানে উসীলা হবে সত্তর গুণ অধিক প্রতিদানের।

[৫৭] সহীহুল বুখারী: ১৯০৪

হালাল খাবার পুষ্ট পবিত্র শরীর আগ্রহী হয় ইবাদাতে। রবের আনুগত্যে তার মিলে অপার্থিব প্রশান্তি। প্রশান্ত হৃদয়ে ইখলাসের সাথে রাখা সওম প্রভুর দরবারে কি কড়া নাড়বে না? অবশ্যই নাড়বে। তাই তো রব মুক্তি দিবেন অন্তরের নোংরামি থেকেও। সকল আবর্জন সাফ করে মুক্ত করবেন গুনাহ থেকে। তনু-মনের সকল আবর্জনা ধুয়ে মুছে বান্দা তাঁর মনিবের সামনে হাজির হবে পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে, শান্ত-সৌম্যতার আধার হয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমাদানের সওম রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেনন।[58]

[৫৮] সহীহুল বুখারী: ১৯০১

রমাদান: দূর হোক অপসংস্কৃতি

১. ইফতার পার্টি
রমাদানের ইফতারির সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিয়াম পালনকারীর জন্য এ বড় আনন্দের - এক দিকে সারাদিন অভুক্ত থেকে খেতে পারার আনন্দ, আরেকদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা করা দোয়া কবূলের আনন্দ। এ সময়টা তাই নিবিষ্টচিত্তে মুনাজাতের, রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ের।

ইফতার করা যেমন বিপুল সওয়াবের উসীলা, অন্য সায়েমকে ইফতার করানোও অশেষ সওয়াবের যারীআহ। হতে পারেন তিনি আত্মীয় অথবা দীনহীন কেউ।
রিকশা দিয়ে মাগরিবের কিছু আগে এসেছেন, রিকশাওয়ালাকে বিনয়ের সাথে বলুন না, 'ভাই! আজকে কি ইফতারিতে আমার মেহমান হবেন?'
কিছু ইয়াতীম তালেবে ইলমকে বলুন না, 'পুরো রমাদান জুড়েই তোমরা আমার মেহমান।'

এভাবে দরিদ্র মানুষগুলোর কিছু সুন্দর সময়ের সঙ্গী হতে পারেন আপনিও। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> “যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে)রোজাদারের (সমান নেকীর অধিকারী হবে। আর তাতে রোজাদারের নেকীর কিছুই কমবে না।”59

কিন্তু এ হাদীসের উসীলা দিয়ে ইফতার পার্টি নামক কিছু কালচার জায়গা করে নিচ্ছে মুসলিমদের মাঝে। কোথাও এর নামে ছেলে-মেয়ে মিলে মেতে ওঠা হয় উল্লাসে, কোথাও ইফতারির বরকতময় মুহূর্তে দোয়ার পরিবর্তে হয় সংগীত পরিবেশন।
তবে কী প্রয়োজন এ সিয়ামের? আল্লাহর রাসূল বলেছেন,

[৫৯] রিয়াদুস সলেহিন : ১২৭৩

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি সওম অবস্থায় মিথ্যাচারিতা ও মন্দ কাজ করা পরিত্যাগ করেনি তার পানাহার পরিত্যাগের কোনোই গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই। আল্লাহ তাআলা তার পানাহার ত্যাগ করার কোনোই পরোয়া করেন না।[60]

তবে কেন আমরা সারাদিন অভুক্ত? এই উল্লাস আর গুনাহ কামানোর জন্য?

ভাই! বোন!
অন্তত রমাদান মাসটাকে কি ব্যবহার না করলেই নয়? ইবাদাতকেও যদি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকি আমরা, তাহলে আল্লাহর জন্য কী করছি? কেউ দোহাই দিবেন, সামাজিক সম্পর্কের। এইসব পার্টিতে অনেককে দাওয়াত করা হয়, একত্রে বসে খাওয়া হয়। এতে সামাজিক সম্পর্কেরও উন্নয়ন হয়।

হ্যাঁ, সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব ইসলামে কম নয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায়, হজ্জের মত গুরুত্বপূর্ন ইবাদাতগুলোতে আমরা তা দেখতে পাই। কিন্তু রমাদান এই সামাজিক সম্পর্কোন্নয়নের বিশেষ মাস নয়, বরং এ মাস আত্মউন্নয়নের। কয়েকটা দিন দুনিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে শুদ্ধ করার অনুশীলনের মাস এ রমাদান। তবে কেন এই হৈ হুল্লোড় আর সামাজিকতার দোহাই দিয়ে রমাদানের উদ্দেশ্যকে ব্যহত করা?

২. ইফতারের বাহারি আয়োজন
আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতারি করতেন কী দিয়ে? দু'টো খেজুর দিয়ে, কখনো সাথে থাকতো সারীদ, কখনো রুটি-গোশত, কখনো শুধুই পানি।
সাহাবায়ে কেরামের ইফতারির আয়োজনও ছিলো তাই। হয়তো কোন দিন দু'টো রুটি ছিলো, ইফতারির আগ মুহূর্তে কোন সায়েল এলো, তারা সে রুটি দু'টো দিয়ে দিতেন, নিজেরা ইফতার করতেন খেজুর আর পানি দিয়ে।

---

৬০ সহীহুল বুখারী: ১৯০৩

সালাফে সালেহীনের যিন্দেগীও ছিলো সাহাবিয়ানা যিন্দেগী। সাদেগী যিন্দেগী আর সাদাকাহর আগ্রহে তাদেরও ইফতারির আয়োজন ছিলো এমনই।
আদতে 'ইফতারির আয়োজন' বলে যে কিছু একটা আছে, তার সাথে তাঁদের কোন পরিচয় ছিলো না। তাঁদের ইফতারি তো হলো, আল্লাহ মাগরিবের আযানের পর সওম ভাঙতে বলেছেন ভাঙছি। 'ইফতারি' আবার কী?
আমাদের দিকে তাকাই। আমাদের ইফতারির আয়োজনে মনে হয়, আল্লাহর আদেশ মানতে আমরা সিয়াম করি নি। বরং, ইফতারিতে সুস্বাদু খাবারগুলো তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার জন্যই সারাদিন অভুক্ত থেকেছি। বাদ আসর থেকে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত গৃহিণীদের কখনো কখনো হুঁশই থাকে না, আযান দিয়ে ফেললো কখন! আযান শুনে তড়িঘড়ি করে এসে খেজুর আর পানি খেয়ে ওড়না দিয়ে কপালের ঘাম মুছে। আর কখনো রান্নাঘরেই এক ঢোক পানি খেয়ে রান্না শেষ করায় ব্যস্ত থাকে।
এটাই এখন আমাদের কালচার হয়ে গেছে। সাদাসিধা দু'মুঠো খাবারের ইফতারি এখন দরিদ্রদের আয়োজন। বাহারি খাবার না হলে লজ্জিত হই আমরা। এর পিছনে বড় কারণ হয়ে থাকে, বাড়ির পুরুষরা। রমাদানে ছুটির সুযোগকে তারা ব্যবহার করেন উদরপূর্তির কাজে। অথচ সে সময়টা হওয়া উচিত আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ।
তবে কিছু মহিলারাও রান্নায় নিজের দক্ষতা প্রমাণে মরিয়া হয়ে উঠেন। সন্তানকে, ঘরের মানুষগুলোর 'ভালো-মন্দ' খাওয়াতে না পারলে তাদের অন্তর শান্ত হয় না। আমরা কবে বুঝবো আল্লাহর জন্য নিজেকে কোরবান করার শান্তি? কবে অনুভব করবো রবের স্মরণেই প্রশান্তি?

৩. ঈদের বাজার
রমাদানের সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ সময় হলো শেষ দশক। হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় কষে লুঙ্গি বাঁধতেন অর্থাৎ, ইবাদাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করতেন। তিনি উম্মাহকে উৎসাহও দিয়েছেন বিশেষতঃ শেষ দশকের ব্যাপারে।

শেষ দশকের গুরুত্ব আরও এজন্যই যে, সে দশরাত্রির কোন এক রাত লাইলাতুল ক্বদর। যে রাত বছরে একবারই আসে, কিন্তু তা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।
এছাড়াও তখন রমাদানের বিদায়ের সময়। সারা বছরের পুঁজি সঞ্চয়ের শেষ সুযোগ। আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার, গুনাহগুলোকে মাফ করিয়ে নেয়ার সময় শেষ হওয়ার পথে। সেজন্যই শেষ দশক এমনভাবে কাটানো উচিত, যেন কেবল আল্লাহই আছেন আমার সামনে আর আমি আছি সাজদায় নুয়ে। ই'তিকাফের মর্মটা এখানেই।
অথচ আমরা কী করি? ইফতারের পর পুরো পরিবার নিয়ে বেরিয়ে যাই ঈদের বাজারে। একদিনে এ বাজার শেষ হয় না। একদিন পোশাকের বাজার, আরেকদিন সাজসজ্জার উপকরণের বাজার, আরেকদিন জুতার বাজার, আরেকদিন ঈদের খাবারের বাজার– এভাবে শেষ দশ দিন কেটে যায়। ঈদ আসার আগেই ঈদের আমেজে ঘরময় হৈ চৈ শুরু হয়।

বান্দা!
গুনাহ কি মাফ হয়েছে? তুমি জানো না।
সওম কবূল হয়েছে? তুমি জানো না।
দোয়া মুস্তাজাব হয়েছে? তুমি জানো না।

অথচ তুমি ঠিক জানো, তোমাকে ঈদের দিন নতুন কাপড় পরতে হবে। কিন্তু এটা তোমার জন্য আবশ্যক কোন বিষয় নয়। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন নিজের উত্তম পোশাক পরতে বলেছেন। নতুন পোশাক কেনার পিছনে ইবাদাতের অমূল্য সময় নষ্ট করতে বলেননি।

তুমি ঠিক জানো, ঈদের দিন ভালো ভালো খাবার খেতে হবে। কিন্তু এটা জরুরী কিছু নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারে সর্বোত্তম খাবার ছিলো রুটি-গোশত। এর চেয়ে উপাদেয় খাবার তিনি খেতে পারেননি। এর মানে কি তাঁর সামর্থ্য ছিলো না? যিনি আসমান যমীনের মালিকের বন্ধু, তাঁর জন্য এ প্রশ্নটা বড়ই বেমানান। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন, সর্বোত্তম খাবারগুলো তিনি জান্নাতে চেয়ে নিবেন। আর আমরা দুনিয়াতেই তাড়াহুড়া করে

চেয়ে নিচ্ছি। তবে কি এই দুনিয়াকেই আমরা বেহেশত ভেবে নিচ্ছি?

ঈদের এ আনন্দ আদতে কিসের?
নতুন জামার? ভালো ভালো খাবারের? সকলের সাথে দেখা সাক্ষাতের নাকি অন্য কিছুর?

দেখুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সওমের আলোচনার পর বলেন,

وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

‘যেন তোমরা সওমের নির্ধারিত সময় পূর্ণ করো এবং যেন তোমরা আল্লাহ্‌র বড়ত্ব বর্ণনা করো আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও’।[61]

এ আয়ত দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রমাদান শেষে ঈদের আনন্দ হলো-

সারা মাস যথাসাধ্য ইবাদত করতে পারার আনন্দ। কেননা আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করো।

এ আনন্দ তাকবীরের। যথাসাধ্য ইবাদাতের ফলাফল হিদায়াত। আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন, এ সুসংবাদের জন্য আল্লাহ্‌র তাকবীরধ্বনি উচ্চারণ করার জন্য এ ঈদ।

এ আনন্দ আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের। ইবাদাত ও হিদায়াতের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের পথ সহজ হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য এ ঈদ।

এ জন্যই প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি ঈদের দিনেও ও ঈদের রাতেও তাকওয়ার পরিচয় দেয়। সে ঈদের রাতো রাসুলের সুন্নাহ মেনে ইবাদতে কাটায়। রাসূলের সুন্নাহ অনুসণে ফিতরা আদায় করে এবং মুসলিম ভাই ভাই সমাবেতভাবে ঈদের সালাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হয়।

---

৬১ সূরা বাকারা : ১৮৫

দেখুন তো, আমাদের ঈদগুলো এমন হয় কি না?
আল্লাহর দেয়া আনন্দের বিপরীত স্রোতে গিয়ে বাতিলের সয়লাবে ভেসে যাই কি না?
আসুন না, শুধরে যাই।

ঘরে ঘরে সাহাবিয়ানা যিন্দেগীর স্ফুরণ ঘটাই।

আমাদের জন্য পরম আনন্দ যে অপেক্ষা করে আছে জান্নাতে।

চলুন না,

দুনিয়ার দিন ক'টা আমরা কাটিয়ে দিয়ে যাই সে মুসাফিরের মত, যার জন্য অপেক্ষা করে আছে জান্নাতের চিরসুখের রাজ্য.....

জীবনের শেষ সালাত

আসুন দুই রাকাত সালাত পড়ি। মনে করুন, মালাকুল মওত আপনার সামনে। বুঝতেই পারেননি, এত দ্রুতই ফুরিয়ে আসবে জীবনের সূর্যস্নাত দিনগুলো; নেমে আসবে অন্তিম সন্ধ্যা। এখন যখন এলো, জীবনের হিসেবের খাতা আপনাকে দিশাহীন করে তুললো।
হায় রব! এখন কী হবে!
হায় রব! আমি তো গাফেল!
হায় রব! আমি তো পথহারা-পথিক!

হায়াত তো দীর্ঘ করার সুযোগ নেই। কিন্তু আপনার হায়াত হয়তো ততটুকু সময়ই বাকী আছে, যতটুকু সময়ে দু'টো রাকাত সালাত আদায় করা যায়। তাই, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হতভম্ব আপনি চাইলেন দু'রাকাত সালাত পড়তে।
ওযু করলেন, যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন। খুব মনোযোগের সাথে, ধীরস্থীরভাবে।
আপনি কি জানেন? আপনার গুনাহগুলো একে একে ঝরে পড়ছে? এরপর পবিত্র কোন কাপড় বিছিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। সানা পড়লেন। পড়লেন–

- 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম'–'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, বিতাড়িত শয়তান থেকে!'

রব! জীবনের এই শেষ নামাযে শয়তানকে দূরে সরিয়ে দাও! যেন সালাতের মাঝে আমাকে মন্ত্রণা না দেয়, ভুলে যাওয়া কথা মনে করিয়ে না দেয়, ব্যস্ততার কথা মনে করিয়ে না দেয়, কোন কর্তব্য স্মরণ করিয়ে সালাত থেকে মন নষ্ট করে না দেয়! আমি যেন মনোনিবেশ করতে পারি শুধুই তোমার প্রতি, অনুতপ্ত সাজদার প্রতি!

- 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'–করুণাময় দয়াশীল আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মালিক!
আমি শুরুতেই বলে স্বীকারোক্তি দিলাম, তুমিই দয়াশীল। তুমিই করুণাময়। আমার পুরো সত্ত্বা জুড়েই তোমার দয়া আর করুণা বিরাজমান। আমি আবারও মুখাপেক্ষি তোমার সেই দয়ার, মুখাপেক্ষী রবো সর্বদাই!

- 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'–সমস্ত স্তুতি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

আপনি কি জানেন, আপনার রব আপনার এ প্রশংসা বাক্যের উত্তর দিচ্ছেন? শুধু এ আয়াতই নই, পুরো সূরার প্রতিটি আয়াতের জবাব দিবেন আল্লাহ তাআলা। এ আয়াতের উত্তর দিচ্ছেন, “আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো।”

- “আর রাহমানির রাহীম”–যিনি অতি মেহেরবান ও দয়ালু। এর উত্তরে আল্লাহ বলছেন, “আমার বান্দা আমার স্তুতি গাইলো”
- “মালিকি ইয়াওমিদ্দীন”–যিনি বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ জবাব দেন: “আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করলো”
- “ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন”–আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ জবাব দেন, “এ বিষয়টা আমার ও আমার বান্দার মাঝেই রইলো। আর আমার বান্দার জন্য তাই, যা সে চাইলো।”

- “ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াললীন”–আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, তাদের পথ - যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ; তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার ক্রোধ রয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ জবাব দেন: “এটা আমার বান্দার জন্যই আর আমার বান্দার জন্য তা-ই, যা সে চাইল।”[62]

এবার না হয় দু'ফোঁটা অশ্রু পড়ুক। এতদিনও এ সূরা পড়েছেন, আল্লাহ জবাব দিয়েছেন, এতটা গভীরভাবে কি অনুভব হয়েছে? এই এখন যখন শেষ মুহূর্ত, মৃত্যু এসে উপস্থিত সবচেয়ে বড় মুসীবতের রূপে; তখন বোধ জাগল। বান্দা! বড় বেশী দেরী হয়ে গেল না তো?!

চোখ দু'টো ভেজাই থাক! অন্তর পেরেশানই থাক! অনুতাপে দেহ নুইয়েই থাক! এভাবেই শেষ হোক দু'টো রাকাত। বিনয়াবনত হয়ে, মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে, গলায় কিছু একটা আটকে গিয়ে। সালাম ফিরানোর পর হাত উঠুক প্রশস্ত দরবারে। আরশে আজীমের রাব্বে আজীমের তরে, যিনি কেবল দিতেই জানেন, নিতে নয়। বলুন–

'আল্লাহ! আল্লাহ!
রাব্বী! আমার রব!
আমার মালিক! আমার মনিব!
তুমি তো সবই শোনো, সবই দেখো।
এই অধমের কথাও শুনছো। একটু দয়া করো, একটু আরজী রাখো!

আল্লাহ! আমি তোমার সে বান্দা, যে নিজের উপরই জুলুম করেছে নিজের মালিককে চিনতে না পেরে।
আমি তোমার সে বান্দা, যে অনবরত গুনাহের জালে জড়িয়েছে, ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয়।

৬২ সহীহুল মুসলিম

আল্লাহ! শয়তানের হাতছানিতে যত দ্রুত সাড়া দিয়েছি, ততই দেরী করেছি তোমার ডাকে সাড়া দিতে।
শয়তান দুনিয়াকে যতটা সুন্দর করে দেখিয়েছে আমার সামনে, ততই দূরে সরে গেছি দ্বীনের সৌন্দর্য থেকে।

মালিক! শয়তানের দোষ আমি দিবো না, সে তো প্রকাশ্যেই আমাদের শত্রু বনে গেছে। আমিই বরং, শত্রুকে চিনেও চিনি নি। নফসের তাড়নায় নিজেই ধোঁকা দিয়েছি নিজেকে!

রহীম! আমি এখন কার কাছে যাবো? কোন দিকে ফিরবো? অনুতপ্ত নফস একটাই দিক দেখালো! একজনের কাছেই নত হতে বললো!

মালিক! সে দিকটি তোমার দিক! সে সাজদা তোমারই তরে। আমার যে আর কোন দিক নেই! আর কোন রব নেই! তুমি যদি আমাকে শাস্তি দাও, তবে তো আমি তোমারই বান্দা। আর যদি মাফ করে দাও, তবে আমি তো জানি তুমি রহীম! রহমান!

আল্লাহ! গোপনে কত গুনাহ করেছি, রাত জেগে মুভি দেখেছি, আমি আমার গুনাহ নিয়ে অনুতপ্ত। কিন্তু তুমি তো সাত্তার! দুনিয়ার মানুষের কাছে আমার গোপন থাকা গুনাহ গোপনই রাখার।

আল্লাহ! সালাত আদায়ে কত উদাসীন থেকেছি। কখনো আদায় করিই নি, কখনো বা শেষ ওয়াক্তের অপেক্ষায় থেকেছি। যেন এ এক দায়, যা সারতেই হবে! অথচ সালাত তো হবে ভালোবাসার, নিজেকে সঁপে দেয়ার।

আল্লাহ! চাকুরী ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অন্যের হকের বেলায় ছিলাম উদাসীন। কিন্তু নিজের হক আদায়ে ছিলাম তৎপর। চাইতে, না চাইতে কত অন্যায় করেছি তোমার সৃষ্টির উপর। দায়িত্ব আদায়ে ছিলাম গাফেল। 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেক্যেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'–এ হাদীস জেনেও জানি নি। আজকে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অন্তর অনুতাপে জর্জরিত....
বাবার কথা মানি নি, মা'কে ঝাড়ি দিতে কসুর করিনি। তাদের মৃত্যুর আগে যেমন তাদের অযতনে অনাদরে অবহেলায় দূরে

সরিয়ে রেখেছি, তাদের মৃত্যুর পরও তাদের জন্য দোয়া করতে পরিচয় দিয়েছি কার্পণ্যের। তারা কি আমার মত সন্তানের জন্য তোমার কাছে লজ্জিত? আমার জন্য কি তাদের জান্নাতে যাওয়া আটকে আছে? আজ বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে, 'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা'........

আল্লাহ!

আল্লাহ!

আল্লাহ!

আর শব্দ আসে না, ভাষা আসে না। কেবল অন্তর ফেটে যাচ্ছে, হৃদয় ডুকরে কাঁদছে। আজকের মত অসহায় নিজেকে এর আগে কখনো লাগেনি! আমি যে তোমার সামনে উপস্থিত হতে এখনো প্রস্তুত নই! অথচ আমি শেষ সময় সম্পর্কে ছিলাম উদাসীন। অপ্রস্তুত এই আমি অপরাধবোধের জ্বালায় জর্জরিত।

ইয়া আল্লাহ!

আমি যদি আমার গুনাহগুলোকে পুণ্যের সাথে ওযন দেই, তবে পাহাড়সম গুনাহের বিপরীতে পুণ্যগুলোকে সর্ষেদানার চেয়েও ছোট মনে হয়। কিন্তু আমি যদি আমার গুনাহগুলোকে তোমার গাফূর নামের বিপরীতে দাঁড় করাই, তবে তোমার এক সিফাতের আলোই গুনাহের সব আঁধার দূর করে দিতে সক্ষম।

রব! আমাকে যদি অনুগ্রহ করো, তবে তোমার অনুগ্রহের খাযানাতে মোটেও ঘাটতি পড়বে না। কিন্তু যদি অনুগ্রহ না করো, আমার সবটাই যে শূন্য হয়ে যাবে! তুমি না আমাকে আমার মায়ের চেয়েও বেশী স্নেহ করো? আমার মা কি আমার এ আহাজারি ফিরিয়ে দিতে পারতো?

রব! তুমিই বলেছে, বান্দা তোমায় ভাবে যেমন, তার কাছে তুমি হও তেমন। আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!........

চলুক, বুকভাঙা আর্তনাদ আর সব হারানোর হাহাকার। কে জানে! এ বেদনাহত আওয়াজ যদি কড়া নাড়ে মহীয়ানের দরবারে, পরবর্তী দিনগুলো হয়তো হয়ে উঠবে নতুন আলোয় দীপ্ত। পথচলা হবে শুদ্ধির পথে.....

রমাদান :কেমন হবে পরবর্তী জীবন

১. গুনাহগুলো পজ না হোক, ক্যান্সেল হয়ে যাক!

আমাদের মধ্যে এক আজব শ্রেণী আছে। যারা রমাদানে গুনাহগুলোকে স্থগিত করে রাখে। অনেকটা বাচ্চাদের গেমস পজ করে রাখার মতো। যা যেখানে যে অবস্থায় আছে, থাক। রমাদান গেলেই আবার শুরু করবো।
যার বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড আছে, সে রমাদানের জন্য দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেয়। কথা-বার্তা বন্ধ করে দেয়। না, ভুল বললাম। সাহরীর সময়ে পরস্পরকে জাগিয়ে দেয়ার ‘মহৎ’ কাজটুকু চালু থাকে।

কারো মুভি দেখার অভ্যাস, পর্নো দেখার নোংরা স্বভাব, মিথ্যে বলা, নেশা করা ইত্যাদি অনেক স্বভাব বন্ধ রাখে। বন্ধু মহলে আবার এর প্রচারও করে। কেউ মিথ্যে বললে চট করে ধরিয়ে দেয়, ‘দোস্ত! রমজান মাস। মিথ্যা কথা কইস না’, ‘দোস্ত! রমজান মাসে সিগারেট খাইতাছস?’, ‘না রে দোস্ত! রমজান মাসে ওইসব ছাইড়া দিসি’।
এই আজবশ্রেণীর সংখ্যা আমাদের সমাজে প্রচুর। কিন্তু কেন?

রমাদান এলে তো গুনাহ দ্বিগুণ হয়ে যায় না। আবার রমাদানের গুনাহ ছাড়া বাকী সব গুনাহ মাফ হয়, এমনও না। গুনাহ সব সময়ের জন্যই অন্যায়, অপরাধ। রমাদানে যেমন, শাবানে তেমন, মুহাররামেও তেমন। বাম কাঁধের ফেরেশতা কি শুধু রমাদানেই নিজের কাজে মনোযোগী থাকেন, অন্য মাসে ফাঁকি দেন?
তবে কাকে ধোঁকা দিচ্ছেন? আল্লাহকে? বুঝাতে চাইছেন, আপনি ভালো হয়ে গেছেন? নাকি মানুষকে দেখাতে চাচ্ছেন, আপনি মুত্তাকী মুসলিম হয়ে গেছেন? এ আয়াতটি কি স্মরণ নেই?

يخادعون الله والذين آمنوا ، ومايخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون

'তারা আল্লাহ্‌ ও মুসলিমদের ধোঁকা দেয়, অথচ তারা তো কেবল নিজেদেরই ধোঁকা দিচ্ছে। আর তারা তা অনুভবও করতে পারে না'।[63]

আর যদি আপনি মনে করেন, রমাদান মহিমান্বিত মাস। এ মাসের পবিত্রতা রক্ষার্থে গুনাহ বন্ধ রেখেছেন। তবে আপনি উৎসাহিত হোন। আল্লাহ্‌ আপনাকে হিদায়াত দিতে চাচ্ছেন। আপনি বুঝছেন, গুনাহ অপবিত্র। কিন্তু ভাবছেন, রমাদান পবিত্র মাস তাই গুনাহ করছেন না। আপনি কি জানেন, শয়তান আপনাকে একটি কথা ভুলিয়ে দিচ্ছে। তা হলো–গুনাহ অপবিত্র, মন্দ। গুনাহ না করার জন্য রমাদান মাসে যতটুকু পবিত্রতা আছে, মহিমা আছে; সে পবিত্রতা ও মহিমা প্রতি মাসেই আছে। রমাদানের মত প্রতি মাসেই গুনাহ লিখা হয় এবং প্রতি মাসেই আমলনামা আল্লাহর কাছে হাজির করা হয়। ঠিক তেমনি, রমাদানে আপনার গুনাহ থেকে বিরত থাকা যেমন আল্লাহকে খুশি করে, অন্য মাসেও আপনার গুনাহ থেকে বিরত থাকা আল্লাহকে খুশি করে। আল্লাহর এ ঘোষণা বছরের পুরো সময়ের জন্যই–

হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আশায় থাকবে তোমার গুনাহ যত বেশি হোক, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো, এতে কোন পরওয়া করবোনা ।

হে আদম সন্তান ! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো, এতে আমি পরওয়া করবোনা।

হে আদম সন্তান ! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমান গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকো, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হবো।"[64]

তবে কেন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে থাকা? কেন শয়তানকে খুশি করা? আপনার মন এখনও আল্লাহকে ভয় পায়, এ ভয় থাকতে থাকতে ফিরে আসুন পূর্ণ ইসলামের ছায়ায়। অপবিত্র গুনাহ ঝেড়ে

[৬৩] সূরা বাক্বারাহ

[৬৪] জামিউত তিরমিযি: ৩৫৪

ফেলে পবিত্র থাকুন সারা বছর, পুরো জীবন। অন্যথায় শয়তান না আপনার অন্তরের বাকী অংশকেও গ্রাস করে ফেলে আর গুনাহ করার প্রতি আপনার এ ভয়কেও দূর করে ফেলে আর আপনি হয়ে উঠেন তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের অন্তরে আল্লাহ্ সিল মেরে দিয়েছেন। তারা সত্য দেখে না, শোনে না, বুঝে না।
যাদের অন্তরে সিল আঁটা, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের পর এঁটে দেয়া হবে সবগুলো দরজা। তারা সেখান থেকে না বের হতে পারবে, না সেখানে মৃত্যু হবে।

অনন্ত শাস্তির ভয়ে হলেও ফিরে আসুন। আল্লাহ্ আপনার ফেরাতে খুশি হবেন। আমাদের গুনাহগুলো রমাদানের জন্য পজ না হোক, আজীবনের জন্য ক্যান্সেল হয়ে যাক।

২. তাকওয়া হোক সারাবছরেরই পাথেয়

রমাদান তাকওয়ার মাস, তাই বলে তাকওয়া একমাত্র রমাদানের জন্য নয়। তাকওয়া একটি জীবনব্যাপি প্রক্রিয়া। মুমিনকে তাকওয়া অবলম্বনের মধ্য দিয়ে নিজেকে মুমিন প্রমাণ করতে হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তাকওয়া ধারণ করা অপরিহার্য। তাই তো আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

‘তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মরো না’। [65]

মৃত্যুর পরের জীবনের অন্যান্য পাথেয় হলো তাকওয়া! এ জন্যই আল্লাহ বলেন,

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰۖ

‘তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো। জেনে রাখো, শ্রেষ্ঠ পাথেয় হলো তাকওয়া।‘ [66]

---

[৬৫] সূরা আলে ইমরান: ১০২
[৬৬] সূরা বাকারা : ১৯৭

যারা পৃথিবীতে মুত্তাকি হিসাবে থাকবে দুনিয়াতে তার প্রতিদান এই যে, তার কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্ললাহ বলেন,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

‘যারা আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তাদের বের হওয়ার পথ করে দিবেন এবং তাদেরকে তিনি এমন জায়গা থেকে রিযিক দিবেন, যা সে চিন্তাও করতে পারবে না’। [67]

১৪৪১ হিজরির রমাদানে আমরা যারা এই সংকটপূর্ণ সময়ে রোগের ঝুঁকিতে আছি, অভাব-অনটনে আছি, আমাদের শ্রেষ্ঠ পাথেয় হতে পারে তাকওয়া। ইংশা আল্লাহ, আল্লাহ আমাদের পথ দেখাবেন। তিনি পথ দেখাবেন যখন তিনি ইচ্ছা করবেন এবং যখন কল্যাণকর হবে।

শিআবে আবি তালিবের কথা মনে আছে? আমাদের নবি ও মুসলিমগণ তিন বছর সে গিরিপথের গুহায় অনাহারে সোশ্যাল আইসোলেশনে থেকেছেন। আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করেছেন, তবে তিন বছর পর।

তিনি যা আমাদের জন্য কল্যাণকর নির্ধারণ করেন, তাই ফায়সালা করেন। আমাদের উচিৎ তাকওয়া অবলম্বন করা।

মুত্তাকির পরকালের প্রতিদান হলো জান্নাত। আল্লাহ বলেন,

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

‘জান্নাত প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য’।[68]

আর যারা দুনিয়াতে তাকওয়ার গুণ বর্জন করেছে তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামের হুশিয়ারি দিয়েছেন। কুরানে আছে-

[৬৭] সূরা তালাক : ১-২

[৬৮] সূরা আল ইমরান : ১৩৩

مَا سَلَكَكُمۡ فِى سَقَرَ - قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ -وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ

'জাহান্নামের দ্বার-রক্ষিরা জাহান্নামীদেরকে বলবে, কোন বিষয়টি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা বোলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না, আমরা মিসকীনদেরকে খাওয়াতাম না...'। [69]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন প্রতিবেশিকে ক্ষুধার্ত রেখে পেট ভরে খেতে পারে না'।

এখন তো শুধু পেট ভরে খাওয়া নয়, প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে সম্পদ, অর্থ-কড়ি সঞ্চয় করে সামান্য ক'টা টাকা যাকাত দিয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করি যে, আমি আমার ফরজ দায়িত্ব পালন করেছি।

প্রিয় ভাই,
তাকওয়ার গুণগুলো ছেড়ে, হারামে বা নাজায়েযে লিপ্ত থেকে সিয়াম পালনের দ্বারা তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব নয়। আর তাকওয়া অর্জন ছাড়া সফলতা বড় দূরের পথ। সে পথকে কমিয়ে আনতে, সফলদের মিছিলে একজন হতে তাকওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, নিত্যদিনের পানাহারের মত তাকওয়াকেও অপরিহার্য করে তুলতে হবে।

৩. অব্যাহত থাকুক সওমের অভ্যাস

আমাদের রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাদানের সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এটি আসলে মুত্তাকীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ক্ষমার ঘোষণারই প্রতিধ্বনি। কেননা সওমের দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। যে সওম যথাযথ, যে সওমের উদ্দেশ্য সফল। অর্থাৎ যে সওমের দ্বারা বান্দা মুত্তাকী হতে পেরেছে।

রমাদানের বাহিরেও আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচুর পরিমাণে সওম করতেন। আবুদ দারদা রা. এক

[৬৯] সূরা মুদদাসসির : ৪২-৪৪

হাদীসে বলেন, প্রচন্ড এক গরমের দিনে আমরা সফরে বেরিয়ে ছিলাম। আমাদের মাঝে কেউ-ই তখন সওম করতে পারেনি। আমদের মধ্যে কেবল রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সওম করেছিলেন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশী সওম করতেন যে, বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় সওম ছিল দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সওম। আর তা হলো একদিন সওম করা, আরেক দিন সওম থেকে বিরত থাকা।

আমাদের সালাফগণের কাছেও সওম ছিল অত্যন্ত পছন্দের। ফুযাইল বিন ইয়ায রা. প্রচুর পরিমানে সওম করতেন। বয়সও তার অনেক হয়েছিল। সওমের কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পরতেন। অথচ সেই সওমগুলো রয়ামদানের ফরয সওম ছিল না। তিনি বলতেন, আমি দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।

প্রিয় ভাই-বোন,
শুধু রমাদানের জন্যই সওম করব না, বরং শিক্ষা ও দৃঢ় ইচ্ছা রাখব যে, সওমের এ অভ্যাস সারা বছর জারি রাখব।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর জন্য একবার মজাদার খাবার রান্না করা হলো। তিনি কাউকে সাথে নিয়ে খেতে চাইলেন। একজন বেদুঈনকে পাওয়া গেল। বেদুঈনকে তিনি দাওয়াত করলেন। বেদুঈন বললেন, আমি সায়েম (রোযাদার)।

হাজ্জাজ: এই গরমের দিনে সওম করছেন? আজ ভাঙুন, আগামীকাল রাখুন।

বেদুঈন: আমাকে কি আপনি আগামীকাল পর্যন্ত বাঁচার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন?

হাজ্জাজ: মৃত্যুর খবর তো আল্লাহ্‌র কাছে।

বেদুঈন: তাহলে আমি বাকির আশায় নগদ ছাড়ব কেন?

হাজ্জাজ: খাবার খুব মজার কিন্তু!

বেদুঈন: খাবারের স্বাদ কি আপনার বাবুর্চির হাতে? আল্লাহ জিহ্বায় সুস্থতা রেখেছেন বলে খাবার স্বাদের লাগে।

হাজ্জাজ: কী অদ্ভূত মানুষ! আমি আপনার মতো মানুষ দেখিনি।

প্রিয় পাঠক, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো জালেম শাসকও মেহমান ছাড়া খেতেন না। আর একজন সাধারণ বেদুঈনও নফল সওমের প্রতি কী গুরুত্ব দিতেন!

৪. কিয়ামুল লাইলের আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি রজনী

আল্লাহ ইস্তিগফারের দ্বারা গুনাহ মাফ করেন। ইস্তিগফার পাঠ মুত্তাকীর আরেকটি গুণ। আমাদের রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনে একশত বার ইস্তিগফার পাঠ করতেন। অথচ আল্লাহ কুরআনে জানিয়ে দিয়েছে, আমাদের রাসূলের আগের ও পরের সমস্ত কিছুই আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। এরপরও কত তীব্র ছিল তাঁর ক্ষমা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা! উপরন্তু তিনি তার উম্মাহকে শিখিয়েছেন, কী করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। চাইতেন, তারাও ক্ষমা পেয়ে শামিল হোক সফলদের কাতারে।

ক্ষমাপ্রাপ্তির এক বড় উসীলা হল, কিয়ামুল লাইল তথা রাত জেগে ইবাদত । এটি মুত্তাকীর আরেকটি গুণ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রমাদানের রাত জেগে সালাত পড়বে, তার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু রমাদান নয়, সারা বছর রাতে দীর্ঘ সময় সালাত পড়তেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, ‘সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রাসূলের পা ফুলে যেত’। আমাদের সালাফগণণ রাতের সালাতের বিষয়ে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করতেন। মুত্তাকির গুণ হিসাবে আল্লাহ বলেন,

---

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

‘তাদের পার্শ্বদেশ শয়নক্ষেত্র থেকে দূরে থাকে আর তারা ডাকতে থাকে তাদের রবকে আশায় আশায় ও ভয়ে ভয়ে’। [70]

আমরা সারা বছর তো বটেই, রমাদানেও রাত্রি জাগরণে কত কার্পণ্য করি। বিশ রাকাত তারাবীহ নামকা ওয়াস্তে আদায় করতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

আমাদের রমাদানের দিন হোক সিয়ামের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের সধনায়, যে তাকওয়ার মাধ্যমে আমরা কুরআনকে হুদানরূপে গ্রহণের ওসীলা অর্জন করব আর রাত জেগে জেগে সালাতে সেই কুরআনের চর্চা অব্যহত রাখবো ইন শা আল্লাহ।

সমাপ্ত
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র

[৭০] সূরা সাজদা : ১৬